মাসিক সওগাত

মহররম সংখ্যা, ১৪৪২

সওগাত

মাসিক সওগাত

মহররম, ১৪৪২ হিজরি । ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদক

আসিফ উল আলম সৈকত
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

সহযোগীতায়

মুহাম্মদ আব্দুল কাহহার
মুহাম্মদ বদরুদ্দৌলা তোহা

প্রচ্ছদ

শেখ আ.ল.ম হুমায়ের কায়সান

সূচিপত্র

সাহিত্য-সংস্কৃতি

দুই বিপ্লবী কবির কারবালা : আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি- মোহাম্মদ আবু সাঈদ ১

সাংস্কৃতিক দারিদ্রতা ও অপসংস্কৃতির তোষণ- আদনান তাহসিন আলমদার ৯

নজরুলঃ এক তুখোড় প্রবন্ধ শিল্পী- আসিফ উল আলম সৈকত ১২

ভ্রমনকাহিনী

শেষ সম্রাটের দরবারে- মো. রেজাউল করিম ১৫

গদ্য

স্মৃতিবিলাস- জিনাতুননেছা জিনাত ৩৪

নক্ষত্রকণা- তানভীর মাহমুদ ৩৮

রাজনীতি

তুরস্ক : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামরিক উচ্চাভিলাষ- সাইদুর রহমান ৪৪

প্যান- ইসলামিজম আন্দোলন: আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকট ও সম্ভাবনা- মুহাম্মদ আব্দুল মুকিম ৫০

সমকাল

ধর্মীয় উন্মাদনার ‘পাগলা ঘোড়া’র লাগাম টানবে কে?- মুহাম্মদ মিজানুর রহমান ৫৫

এই মাসে..

সত্য প্রতিষ্ঠায় অনন্য ত্যাগ: হিজরত- আবু মুহাম্মদ মুশফিক ইলাহী ৫৯

ধর্ম

প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন- এম এয়াকুব আলী বাদশা ৬৫

চোখের সুরক্ষা- এম হুমায়ুন কবির ৬৮

নারী জগৎ

জীবন- শুভ্রা চক্রবর্তী ৭০

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার স্বত্তের আইন- মোহাম্মদ আবদুল আলিম ৭২

গ্রন্থকথা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : নির্বাচিত সাক্ষাৎকার ৭৯

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) জীবনদর্শন ৮০

বিজ্ঞান

সায়েন্স ফিকশনের গোড়াতে মুসলিমদের কৃতিত্ব- খায়রাতুন বিনতে বাবুল ৮১

ক্যালিগ্রাফি

প্রভুর সতর্কবাণী- ফাতিমা তাহমিম ৮৪

কবিতা

শহীদে কারবালা- ফররুখ আহমদ ৮৫

একটি সনেট- কাজী নাসির মামুন ৮৫

মুসলমানের ছেলে- হাসান রোবায়েত ৮৬

আমার স্বাধীনতা- রেজাউল করিম ৮৬

কবি নজরুল- মুহিব কাদেরী ৮৭

ফোরাত নদীর কুল- সাদিয়া জান্নাত ৮৭

মুহররমের আগমনি গান- সৈয়দুল হক ৮৮

এক দেহে এক মন- শাওয়াল হোসাইন ৮৮

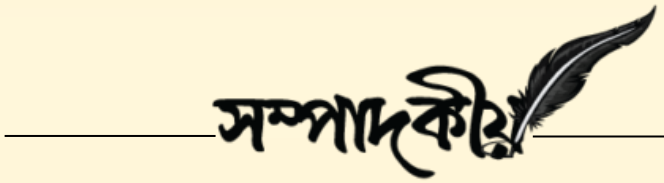

চারিদিক স্থবির, অন্ধকার। মানুষ আজ স্বাধীন হয়েও রুদ্ধ। বাঁচার তাগিদে এই রুদ্ধতাকে কেউ হয়তো মানিয়ে নিচ্ছে, কেউ জয় করছে, আবার কেউ বা হারিয়ে যাচ্ছে কালের কর্ভে। এই অন্ধকারের মাঝেও হঠাৎ কোথা থেকে যেন আসছে আলোর বিচ্ছুরণ। এ যেন, হতাশার মাঝেও বেঁচে থাকার একবুক আশা; অমাবস্যার অন্ধকার কাটিয়ে চাঁদের উপস্থিতি। এখন কেবলই পূর্ণিমার অপেক্ষা।

চাঁদের পূর্ণতা প্রাপ্তির এই সময়ে জ্ঞানের জোছনা বিলাতে প্রথম চন্দ্রমাসে আপনাদের হাতে পৌঁছে দিলাম, প্রথম মাসিক সওগাত। জ্ঞানের সওগাত, ত্যাগের সওগাত, বিশ্বাসের সওগাত, আশার সওগাত, ভালোবাসার সওগাত, শোক নয় শক্তির সওগাত এখন আপনাদের হাতে। জ্ঞান- জোছনায় ভরে উঠুক আমাদের জীবন, দূরীভূত হোক সমস্ত অন্ধকার। সওগাতের প্রতি সকলের ত্যাগগুলোকে মালিক কবুল করুন। সব ভুল আমাদের, ফুল সব সুমহান প্রতিপালকের।

প্রবন্ধ

দুই বিপ্লবী কবির কারবালা : আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

মোহাম্মদ আবু সাঈদ

প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র বিবেকসম্পন্ন- কারো বিবেকের সাথে কারো ভাগাভাগি নেই। প্রত্যেককে নিজের মতো চিন্তাভাবনা করার জন্য পৃথক- পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে। গ্লাসের অর্ধেক পানির মতো- কেউ বলে অর্ধেক খালি, কেউ বলে অর্ধেক ভর্তি, আবার কেউ বলে অর্ধেক থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। এভাবেই একটি বিষয়কে আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন- ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, দেখতে অভ্যস্ত এবং এটাই স্বাভাবিক। একটি ঘটনাকে যেভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, একটি বইকে যেভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে রেখে পাঠ করা হয় তদ্রূপ কারবালার মতো একটি শ্রেষ্ঠ স্পর্শকাতর, মর্মান্তিক ঘটনাকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, বিচার- বিশ্লেষণ করা হয়। এই যে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, এটা অন্তত বাংলায় অনুপস্থিত ছিল ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কারবালার ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত পুঁথি- পাতার স্রোতে অবরুদ্ধ ছিল মীর মশাররফের বিষাদ সিন্ধুর আবির্ভাব পর্যন্ত। উনিশ শতকের শেষদিকে (১৮৮৫- ১৮৯১) বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাংলায় কারবালার প্রতি কোনো বাঙালির ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পতিত হয়েছে- এই দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য ভিন্ন বিধায় এটাকে বৈপ্লবিক বলা চলে না। ষোলো শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ এবং দৌলত উজির বাহরামের মাধ্যমে কারবালার ঘটনাকে উপজীব্য করে যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' ভূমিষ্ট হয় বাঙালি- মুসলমান তাকে বহুত আদরযত্নে লালন- পালন করেছিল উনিশ শতক পর্যন্ত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙালি- মুসলমানের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য- ব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র দু'টি লাইনে সেই 'মর্সিয়া সাহিত্য'র মায়া থেকে মুসলমানদের উত্তরণের জন্য সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলেন। 'ফিরে এলো আজ সেই মহরম মাহিনা - ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না' পঙক্তির মাধ্যমে তিনি কারবালাকে স্মরণ করে কেবল শোক- বিলাপের প্রথা থেকে বাঙালি- মুসলমানকে বের করার কার্যক্রম হাতে নেন। এটাকে আমি চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিপ্লব বলতে চাই। কারবালার প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এ বৈপ্লবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের স্বকীয়তা বিশিষ্ট করেন দু'জন কবি- বে- নজীর আহমদ এবং ফররুখ আহমদ। বাঙালি- মুসলমান কবি হিসেবে চিন্তাধারায় এবং জীবন- যাপনে উক্ত দু'জনকে 'বিপ্লবী' বলে চিহ্নিত করলে সভ্য পাঠকের মোটেই আপত্তি থাকার কথা নয়।

বে- নজীর আহমদ (১৯০৩- ১৯৮৩)

কবি বে- নজীর আহমদ কারবালাকে উপলক্ষ করে কবিতা লিখেছেন দু'টি[১]। কবির জিন্দেগী কাব্যগ্রন্থে সে দু'টি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবিতা দু'টিতে কবি কারবালাকে দেখেছেন সত্য- মিথ্যা, ন্যায়- অন্যায়, মজলুম- জালিমের জয়- পরাজয় হিসেবে। শরীয়তকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে, বাবার ওয়াদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জালেম এজিদ যখন মজলুম প্রতিবাদী ইমাম হুসাইনকে সপরিবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন তখন তো এ ঘটনাকে সত্য- মিথ্যার লড়াই, ন্যায়- অন্যায়ের এসপার- ওসপার হিসেবে দেখা যায় খুব সহজেই।

মহরম সেই বেদনার স্মৃতি- নিখিল জাহান স্মরিছে আজ-
মানুষ কেমনে মানুষেরই লাগি নির্ভয়ে পরে মৃত্যু- তাজ;
নিত্যেরে স্মরি, সত্যেরে স্মরি কেমনে মানুষ সর্ব সুখ
হেলায় ত্যজিয়া ব্যথার- বজ্র উল্লাসে লয় পাতিয়া বুক!

এ চার লাইনে আমরা দেখছি, কবি কারবালার শহীদদেরকে দেখছেন 'মানুষেরই লাগি নির্ভয়ে মৃত্যু- তাজ' পড়তে। অর্থাৎ, তাঁদের জীবন যে তাঁরা নিঃস্বার্থে কোরবান করেছেন, তাঁরা যে 'হেলায় ত্যজিয়া ব্যথার- বজ্র' বুক পেতে নিয়ে আগত পৃথিবীবাসীর নিকট ন্যায়ের পুলসিরাতে দণ্ডায়মান থাকার একটি আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তা- ই কবির চোখে বড়ো হয়ে ধরা দিয়েছে।

মান চাহে শুধু প্রাণ নাহি চাহে, চাহে না বিত্ত, চাহে না ধন
মুক্তা নহে রে মুক্তির লাগি কেমনে করে সে সর্বপণ!
অত্যাচারীর দণ্ডেরে নহে- ন্যায়দণ্ডেরে করে সে ভয়-
মহরম সেই অমর- অভয় ব্যথা- গরিমার গাহিছে জয়।

কারবালার একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে উক্ত চার লাইনে: 'মান চাহে শুধু প্রাণ নাহি চাহে'- কেবল বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকাতে যে কোনো মহত্ত্ব নেই, একজন মহৎ মানুষ যে কেবল বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকতে চায় না, থাকে না, একজন মহামানবের জীবনে যে প্রাণের চেয়ে মান বড় হয়ে উঠে তার সরাসরি দর্শন কারবালার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন কবি। ইমাম হুসাইন সপরিবারে বেঁচে থাকতে পারতেন আরও অনেকদিন, আরাম- আয়েশে রাজার হালে কাটাতে পারতেন বাকি জীবন; কিন্তু তিনি মানকে কোরবানি করে প্রাণকে আগলে রাখেননি, প্রাণকে কোরবানি করে মানকে চড়িয়েছেন অমরত্বের শিখরে। কারবালার মাধ্যমে ইমাম হুসাইন

প্রমাণ করেছেন, মহৎ জীবনের তরে প্রাণের প্রশ্নে আপস চলতে পারে কিন্তু মানের প্রশ্নে কখনোই ন্যূনতম আপসও নয়। সক্রেটিস বলেছিলেন: "যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকাই শেষ কথা নয়, শেষকথা সৎভাবে বেঁচে কথা"- এর বাস্তবতা গড়ে গিয়েছেন ইমাম হুসাইন।

পরের দু'লাইনে তো দর্শন আরও গভীর! কারবালার প্রান্তরে সপরিবারে ইমাম হুসাইন তো অত্যাচারীকে ভয় পাননি বিন্দুমাত্রও, ভয় পেয়েছেন ন্যায়কে- ন্যায়ের ভয়েই শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন সপরিবারে কারবালায় নৃশংসতম উপায়ে শহীদ হলেন। মজলুম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ন্যায়াশ্রয়ী যে কখনোই অত্যাচারীর দণ্ডকে ভয় করে না, মূলত ন্যায়দণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ভয়েই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, 'মহরম সেই অমর- অভয় ব্যথা- গরিমার' জয় গাইবে চিরকাল।

কারবালা শুধু নহে সে আরবে নিখিল জুড়িয়া বাজে সে আজ!
জালেম এজিদ জুলুম আনিছে ব্যথিতের বুকে হানিয়া বাজ।
এস বীর এস, শহীদ হোসেন! যেথায় রহ না সুদূর ঠাঁই-
মজলুম ধরা চাহিছে তোমায়- চাই বীর সূত, শহীদ চাই।

ধরায় আজও যে জালিম এজিদ আছে, জালিমদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য যে আজও হুসাইন দরকার সে- কথা স্মরণ করিয়ে কবি কারবালার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরার মাধ্যমে এ কবিতার ইতি টানলেন।

কারবালাকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে রেখে কবি রচনা করেছেন 'কারবালা নবতর' কবিতা। আজকের বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বও যে ন্যায়- অন্যায়, সত্য- মিথ্যার কারবালায় পরিণত হয়েছে, সে ময়দানে যে আমাদের ইমাম হুসাইনের আদর্শকে প্রেরণা হিসেবে শিরে নিতে হবে, সে ময়দানে যে ন্যায়ের পক্ষে ১৩০০ বছর পূর্বের কারবালা আমাদের জন্য তাজা নিদর্শনরূপে হাজির হয় তার দরস দিলেন কবি বে- নজীর আহমদ।

তেরোশ বরষ পর-
মহরম আজ এলো ফের লয়ে
কারবালা নবতর।
তেরশ বছর পার হয়ে ফের

আমাদের আছমানে-
নূতন আশার নব বাঁকা চাঁদ
জীবনের জ্যোতি আনে।
মানুষ আমরা সবাই হেথায়
বাদশাহ- নফর কেহ
নাই হেথা ভাই।- এক জাতি মোরা
এক প্রাণ এক দেহ।
দুনিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে আজ
সবলের রাহাজানি-
তারে না দলিয়া হবে না নীরব
আল্লার মহাবাণী।
বয়েছে ধরায় পূত যে শোনিত
সীমারের খঞ্জরে
তারি সয়লাবে ডুবিবে এজিদ-
আছি জাগি তারি তরে।
নাহি নাহি সংশয়
প্রতি কারবালা শেষে ইসলাম
নব সে জন্ম লয়।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮- ১৮৭৪)

কারবালাকে কেন্দ্র করে ফররুখ আহমদ কবিতা লিখেছেন চারটি- নতুন মোহাররাম (আজাদ করো পাকিস্তান : ১৯৪৬) শহীদে কারবালা (সিরাজাম মুনীরা : ১৯৫২), শহীদে কারবালা (মুহূর্তের কবিতা : ১৯৬৩), এজিদের ছুরি (কাফেলা : ১৯৮০)[২]।

কারবালাকে সত্য- মিথ্যা, ন্যায়- অন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন ফররুখ আহমদ- এবং তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ন ঘটেছে একাধিক কবিতায় বিক্ষিপ্ত অংশে। *সিরাজাম মুনীরা* কাব্যগ্রন্থে 'শহীদে কারবালা' কবিতায় তিনি লিখেছেন:

বাজে রণ- বাজা, মাতে দুশমন কাঁপে শংকিত পৃথ্বীতল
দাও সাড়া দাও মুজাহিদ সেনা! সত্য পথের সাধকদল।

মুহূর্তের কবিতা কাব্যগ্রন্থের ‘শহীদে কারবালা’ কবিতায় দেখি:

স্মৃতির পাথরপটে সে কাহিনী র’য়েছে অম্লান
উজ্জ্বল রক্তের রঙে, মোছেনি তা মরু সাহারায়,
লোভের পঙ্কিল পথে অথবা রাত্রির তমসায়
যেখানে জ্বালালো দীপ সত্যাশ্রয়ী আদম সন্তান।
নির্ভীক মুসার পণ, খলিলের সুদৃঢ় ঈমান
যেখানে দেখেছি দীপ্ত, মসীকৃষ্ণ রাত্রের ছায়ায়
কুতুব তারার মত প্রোজ্জ্বল আপন মহিমায়
যেখানে দেখেছি চেয়ে সর্বত্যাগী হুসেনের দান
যেখানে শুনেছে প্রান মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের গান
পুঁথির পাতায় নয় জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ॥

উক্ত কবিতায় আমরা দেখি, কারবালার দর্শনকে জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন কবি ফররুখ আহমদ- তিনি কারবালাকে দেখেছেন ‘সত্যাশ্রয়ী আদম সন্তান’র প্রজ্জ্বলিত প্রান্তর হিসেবে আর ‘জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায়’ অঙ্কিত কারবালার লহুসফেন।

কারবালা তো জালেম- মজলুমের লড়াই- একপাশে জালেম এজিদের ঘাঁটি আরেক পাশে মজলুম হুসাইনের সপারিবারিক উপস্থিতি। উনিশ শতক পর্যন্ত বাঙালি- মুসলমান কেবল কারবালার কাহিনী স্মরণ করে বুকের ছাতি পিটিয়েছে, বিলাপ করতে করতে মূর্ছা গিয়েছে, শোকে বিধ্বস্ত হয়েছে শতকের পর শতক- কবি ফররুখ আহমদ কারবালার মর্মশাঁস উপলব্ধি করে ‘জালেম- মজলুমের’ তত্ত্ব বিকশিত করেছেন কবিতায়। এজিদরূপে প্রতি যুগে জালেম আসে এবং প্রতি যুগেই হুসাইনরূপে আসে সত্যাশ্রয়ী বীর, যারা রুখে দেয় জালেমদের জুলুম- এ বোধ বাংলা কবিতায় প্রবেশ করেছে খুব বেশিদিন হয়নি। যেসব কবিগণ কারবালা- নির্গত এ বোধ কবিতায় বিকশিত করেছেন তাঁদের মধ্যে ফররুখের স্থান অতিউঁচুতে।

সিরাজাম মুনীরা কাব্যগ্রন্থে ‘শহীদে কারবালা’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

উতারো সামান, দাঁড়াও সেনানী নির্ভীক- সিনা বাঘের মত।
আজ এজিদের কঠিন জুলুমে হ’য়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত,
মুমিনের দিল জ্বলছে বে- দিল জালিম পাপীর অত্যাচারে,
নিহত শান্তি নিষ্কলঙ্ক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে,
হেরার রশ্মি কেঁপে কেঁপে ওঠে ফারানের রবি অস্ত যায়!
কাঁদে মুখ ঢেকে মানবতা আজ পশু শক্তির রাজসভায়!

আজাদ করো পাকিস্তান কাব্যগ্রন্থে 'নতুন মোহাররাম' কবিতায় লিখেছেন:

আজিকে জেহাদ এজিদের সাথে,
দল বেঁধে এসো খুনেরা- প্রভাতে
ভাঙো জুলুমের জুল্‌মাত : হোক
জালিমের শিরে বজ্রপাত ॥

চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য কারবালাকে জালেম- মজলুমের দৃষ্টিতে দেখে সেখান থেকে অনুপ্রেরণা ঋণ নিয়েছেন ফররুখ- উক্ত কবিতাংশটি তার প্রমাণ বহন করে।

কাফেলা কাব্যগ্রন্থের 'এজিদের ছুরি' কবিতায় ফররুখ আহমদের রূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং গভীর শৈল্পিকতায় নিমগ্ন:

আমার দুঃস্বপ্নে আজ ফেরে ক্রুর এজিদের ছুরি
আজ সীমাহীন তীক্ষ্ন খঞ্জরের নীচে কাঁপে সংখ্যাহীন
ভারাক্রান্ত প্রাণ
আবার সম্মুখে মোর ঘনালো এ কোন্ মৃত্যু কারবালা ময়দান?
মানুষের মুক্ত মাঠে আনিয়াছে কা'রা
এজিদের ছুরির পাহারা!
সম্মুখে মৃত্যুর বাধা পশ্চাতে ক্রন্দন অগণন...
ঢাকা প'ড়ে গেছে আজ নর্তকীর নূপুর নিক্কণে
কোরানের ধ্বনি
জালিমের বজ্রমুষ্টি ঢাকিয়াছে নবীজীর উন্মুক্ত সরণি।

জালেম- মজলুমের তত্ত্বকে পুঁজি করে ফররুখ আহমদ আজও কারবালাকে স্বচক্ষে অবলোকন করছেন, আজও 'এজিদের ছুরির পাহারা'র তলায় ক্লিষ্ট হওয়া 'সংখ্যাহীন ভারাক্রান্ত প্রাণ'র আর্তনাদ শুনতে পান তিনি। সমকালের প্রতিটি জালিমকে এজিদ- সীমার এবং প্রতিটি মজলুমকে হুসাইন হিসেবে গণ্য করে কারবালাতে উপস্থিত হয়েছেন ফররুখ, যে- কারণে কারবালাকেন্দ্রিক প্রতিটি কবিতায় কারবালার ছদ্মাবরণে ফররুখের প্রতিবাদী- মানস প্রকাটাকারে ভেসে উঠে এবং তাঁর প্রতিবাদী- মানসের ভিত্তি এতোটাই পোক্ত ও আকার এতোটাই চওড়া যে, চাইলেই পাঠক এড়িয়ে যেতে পারে না। একজন আধুনিক কবি হিসেবে কারবালার প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গি ফররুখ আহমদের কাব্য- জীবনের একটি সফলতা হিসেবে গণ্য না করে উপায় থাকে না।

প্রবন্ধ

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিকতা কাকে বলে? একটি ঘটনা, বিষয় ও প্রসঙ্গকে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি বহিরাগত কোনো দৃষ্টিতে দেখে অভিনব কিছু বের করা এবং ধর্মীয় বোধকে গৌণ রেখে মানবীয় বোধকে প্রাধান্য দেওয়াকেই হাল- আমলে আধুনিকতা বলে চিহ্নিত করা হয়। আধুনিকতার এ সংজ্ঞায়নের ভিত্তিতে কবি বে- নজীর ও ফররুখকে কারবালাকেন্দ্রিক কবিতায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্মাতা না বলে পারা যায় না। যখন দেখি বে- নজীর উচ্চারণ করেন: **মানুষ কেমনে মানুষেরই লাগি নির্ভয়ে পরে মৃত্যু- তাজ; মান চাহে শুধু প্রাণ নাহি চাহে; অত্যাচারীর দণ্ডেরে নহে- ন্যায়দণ্ডেরে করে সে ভয়;** তখন তো তাঁকে কারবালার প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কবি না বললে বড্ড জুলুম হয়ে যায়। যখন ফররুখের কণ্ঠে শুনি: **পুঁথির পাতায় নয় জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায়; আজ এজিদের কঠিন জুলুমে হ'য়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত; আমার দুঃস্বপ্নে আজ ফেরে ক্রুর এজিদের ছুরি; মানুষের মুক্ত মাঠে আনিয়াছে কা'রা এজিদের ছুরির পাহারা;** তখন তো তাঁর আধুনিকতাকে অস্বীকার করা মানে হুসাইনের গলায় সীমার হয়ে ছুরি চালানো!

বাংলা সাহিত্যে কারবালাকেন্দ্রিক কাব্য রচনা হয়েছে অঢেল, কিন্তু বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির পর্যবেক্ষণে আধুনিক কবিতার ময়দানে কারবালাকে আমদানি করেছেন গুটিকয়েক লেখক, তন্মধ্যে উক্ত দু'কবির স্থান বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত। কারবালার ঘটনা ধর্মীয় বেধরেখা অতিক্রম করে মানবীয়- বোধে আচ্ছন্ন এক আকর্ষণীয় উন্মত্ততায় প্রলুব্ধ করে সকলকে, মাইকেল মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন: We have just got over the noise of the Mohurrum. I tell you that:- if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. সরল তর্জমা: "আমরা কেবল মহররমের বিলাপের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছি। আমি আপনাকে বলছি যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোনও মহান কবির আবির্ভাব ঘটতো, তবে তিনি হোসেন এবং তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুতে একটি দুর্দান্ত মহাকাব্য লিখতে পারতেন। তিনি তার পক্ষ থেকে পুরো জাতির অনুভূতি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন। আমাদের তেমন কোনো বিষয় নেই (মহাকাব্যের জন্য)।"[৩]

বাংলা সাহিত্যে কারবালাকে নিয়ে সে- রকম উপাদেয় মহাকাব্য কেউ লিখতে পেরেছেন কি- না সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু কারবালাকে আধুনিক কাব্যের মঞ্চে উপাদেয় আকারে হাজির করার প্রধান কৃতিত্ব উক্ত দু'কবির, সে- বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করাও বোধহয় জুলুম হবে।

**প্রতিটি কবিতাই প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রেক্ষিতে খণ্ডিত অংশ মাত্র, কোনো কবিতাই সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হয়নি। তথ্যসূত্র অনুসারে আগ্রহী পাঠকগণ পড়তে পারেন।*

তথ্যসূত্রঃ

১. বে- নজীর আহমদ রচনাবলী : শাহাবুদ্দীন আহ্মদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, ১৭১- ১৭৩ পৃষ্ঠা
২. ফররুখ আহমদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, ৯৩, ২০৫ ও ৪৭৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ডঃ ১৯৯৬, ৫০ পৃষ্ঠা
৩. মধুসূদন রচনাবলী : অজিতকুমার ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, ১৯৪২, ৮৪৯ পৃষ্ঠা

লেখক-
মোহাম্মদ আবু সাঈদ
শিক্ষার্থীঃ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, অনার্স প্রথম বর্ষ।
প্রকাশিত বইঃ **বাংলা কাব্যে নবী- বন্দনা এবং নজরুলের মুনশিয়ানা** [বইসই, ২০২০]

প্রবন্ধ

সাংস্কৃতিক দারিদ্রতা ও অপসংস্কৃতির তোষণ

আদনান তাহসিন আলমদার

৭১ এর আগের বাঙ্গালি বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস খুব একটা গৌরবে উজ্জ্বল নয়। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ইতিহাসে বাঙ্গালি শিক্ষা- সংস্কৃতি ও ধনে- মানে, সব দিক দিয়েই মোটামুটি পিছিয়ে আছে, যা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। যুদ্ধের সময় আশা- আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচুর। পরাধীনতায় গায়ে লেপ্টে যাওয়া অপূর্ণতা দূর করে এবার সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বরূপ প্রকাশ করার যে ইচ্ছা শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছিল, গত ৪৯ বছরেও তা যে অর্জিত হয়েছে, সেটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। আর এই যে অর্জনের কথায় অপ্রাপ্তির ঢেকুর, এ বড়ই দুঃখ- বেদনা, লজ্জা ও গ্লানির। তোষণ আর পোষণে আমাদের গ্রহণের ব্যর্থতা আঙ্গুল দিয়েই যেন দেখিয়ে দেয় এই গ্লানি।

এই যে অপূর্ণতা, এই অপূর্ণতার মূল কারণ অনুসন্ধানপূর্বক উদঘাটন জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন। যেখানে বিশ্বপরিসরে উন্নয়নশীল পিছিয়ে পড়া দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে অশ্বগতিতে, সেখানে আমরা দিন- দিন পিছিয়ে যাচ্ছি ক্রমান্বয়ে। যার প্রাথমিক ও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হলো আমাদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের দারিদ্র্যতা। এই দারিদ্র্যতা আর্থিক দারিদ্র্যতার চাইতেও মারাত্মক; ঘাতক ব্যাধির চাইতেও ভয়ঙ্কর। সমাজের মন- মানসিকতা গঠনের পক্বতার স্থানে পঁচন ধরিয়ে দেওয়া এর ভয়াবহ পরিণতি। যা দৃশ্যমান হয় একেবারে মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে।

আমরা এখনো নৈতিক মূল্যবোধের জায়গাটা আমাদের শিক্ষার্থী বা অন্যান্যদের কাছে পরিষ্কার করতে পারিনি। সুস্থ মানসিকতা বিকাশে নিতে পারিনি কার্যকর পদক্ষেপ। সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছেঁয়ে গেছে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনায়। গণতন্ত্রের ধারক- বাহক সেজে বসে থাকা আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ, তদীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ বর্তমানে এই অশ্লীলতা, বেহায়া ও বেলাল্লাপনাকে পৃষ্ঠপোষণ করে যাচ্ছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। এরিস্টটল এরূপ দর্শনে বলেছেন, "**গণতন্ত্রে দরিদ্ররাই শাসন করবে; তবে দরিদ্র থাকার জন্য নয়, সম্পদ ও সংস্কৃতিতে ধনী হওয়ার লক্ষ্যে।**" এক্ষেত্রে এরিস্টটলের ইচ্ছা কিংবা বাণী সত্যতা পাওয়ার মতো সামাজিক কাঠামো বা ব্যবস্থা, কোনটিই আমরা একেবারে মৌলিক পর্যায় থেকেই শুরু করতে পারিনি। আর যার

ভিত্তির নিশ্চয়তা নেই, তার ছাদ দেওয়া ভাসমান সমুদ্র দেখার মতই কাল্পনিক। আর যদি আকাশ কে সমুদ্র কল্পনা করে তৃপ্ত হতে চান, তবে যুক্তি- তর্ক বৃথা।

দর্শনের বরাতে বলতে গেলে আচরণকে আমরা অনেকটা স্ব- নির্ধারিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হিসেবে পেয়ে থাকি। তবে এই স্ব- নির্ধারিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দিকটি অনেকটা প্রভাবিত হয় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার রোষানলে পড়ে। সুতরাং, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি আমার চিন্তা- চেতনায় অশ্লীলতা ইঞ্জেক্ট করতে চায়, তবে আমার আচরণে তার সামান্য হলেও প্রভাব যে পড়বে, তা বহুলাংশেই স্বাভাবিক। আর এই সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তায়ন, মূল্যবোধের অঙ্গিকারবিহীন নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতা, এসব আমাদের সমাজের মানসিক পরিপক্কতার পথের অন্যতম অন্তরায়। ধর্মীয় দিক থেকেই শুধু না, বাঙ্গালিত্বের মৌলিক পর্যায় বিবেচনায় আনলেও এই দিকটি আমাদের কৃষ্টি- সংস্কৃতির উপর বড় ধরণের হুমকি।

ফেসবুকের কল্যাণে চ্যাট হচ্ছিল ফিলিপাইনের এক ভদ্র- মহিলার সাথে। কথাপ্রসঙ্গে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, বাঙ্গালি যে- সমস্ত মানুষের সাথে তিনি ইতোপূর্বে চ্যাট করেছেন, অধিকাংশই উনার কাছে কথার এক পর্যায়ে গিয়ে অশ্লীল ছবি চেয়ে থাকেন, পাঠাতে বলেন 'ন্যুড'। ফলে উক্ত ভদ্রলোকেদের স্থান হয় ব্লকলিস্টে। আর এই লেখার প্রেক্ষিতেই আমি মনে করি, এই যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, এই আগ্রাসনের পরিণামেই ফিলিপাইনের মেয়ের কাছে 'ন্যুড' চাইতে দু'বার ভাবছেনা আমাদের 'সোনার ছেলেরা'। যার ফলে, নিজের দেশের মানুষের ভাবমূর্তি অন্যের সামনে খুব বাজেভাবে ফুটে উঠছে।

হিসেব কষতে বসলে দেখা যাবে, এ তো সামান্য ফলাফল, একটা জেনারেল সিনড্রোম মাত্র। এর বাইরেও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের অভাব আমাদের সকল ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে ধীরে- ধীরে। যার পরিণাম হয়তো অদূর ভবিষ্যতে গিয়ে এমন হতে পারে, 'বাঙ্গালির সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়, তাও আমাদের আগামি প্রজন্ম জানবে না'।

দাঁত থাকিতে দাঁতের মূল্য না বোঝা মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। কিন্তু এক্ষেত্রে না বুঝলে তা হবে আমাদের কৃষ্টি- সংস্কৃতির উপর চরম অন্যায়। নিজেদের চোখের সামনে এভাবে উলঙ্গপনাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের শুদ্ধ সংস্কৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। বস্তুত, এমন কার্যকলাপ চিন্তাশীল মানুষ সহ্য তো করতে পারেন- ই না, বরং বহুলাংশেই ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় এনে বিচলিত, বিস্মিত, এমনকি আতঙ্কিত পর্যন্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং, সময় থাকতেই এসব ক্ষেত্রে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ একান্তই জরুরি। পচন যা ধরছে, তা যেন সারা অঙ্গে ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে সকলের সাবধানতা একান্তই জরুরি বলে মনে গাঢ় ধারণা জিইয়ে রেখে দিলাম এ ক্ষণে।

লেখক-
আদনান তাহসিন আলমদার
শিক্ষার্থীঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ, অনার্স তৃতীয় বর্ষ।
প্রকাশিতব্য বইঃ **বিনি সুতোর রাজনীতি**

প্রবন্ধ

নজরুলঃ এক তুখোড় প্রবন্ধ শিল্পী

আসিফ উল আলম সৈকত

শ্রীশচন্দ্র দাস বলেন, "কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়ে লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য- রূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলে[১]।" প্রবন্ধ দুই ধরণের। এক, তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। এই ধরণের প্রবন্ধতে সুচিন্তার একটি সীমারেখা নির্ধারিত থাকে। এখানে 'গরু' নিয়ে লিখতে গিয়ে 'গোপালক' সম্বন্ধে একটি কথাও বলা যাবেনা। এই ধরণের প্রবন্ধে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং বুদ্ধির প্রখরতা পাঠকের মস্তিস্কের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, হৃদয়ের সাথে নয়। আরেক ধরণের প্রবন্ধ হলো, মৃন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। এই প্রকার প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিচিন্তার চেয়ে ব্যক্তিহৃদয়ই প্রধান[২]। প্রবন্ধের এই শ্রেণী বিভাজন দেখলে সহজেই বুঝতে পারি যে, নজরুল- প্রবন্ধ দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, মৃন্ময় প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। নজরুল- প্রবন্ধে ভাব- রস, অলংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার এতই বেশি যে, প্রবন্ধগুলো মানুষের মনের গভীরে গিয়ে আঘাত করে। সমালোচকদের মতে, প্রবন্ধের এই ভাব- রস, অলংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের আধিক্যই নজরুল- প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। নজরুল- প্রবন্ধের 'ত্রুটি' সম্পর্কে ড. সুশীল কুমার গুপ্ত বলেন, "নজরুলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি মননশীলতার স্বল্পতা ও শিল্পসৌষ্ঠব সম্পর্কে আবেগ প্রাবল্যজনিত উদাসীনতা ও অসতর্কতা[৩]।" ঠিক এই কারণেই বলা হয়, "নজরুল জাত প্রাবন্ধিক না।"

নজরুল- পূর্বে অনেকেই মৃন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেখানে গুরুর আসনে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেকেই আছেন শিষ্যের আসনে। কিন্তু নজরুলের রচনাশৈলীর সাথে এঁদের কারোরই কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নজরুলের 'অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল' ভাব তাঁর প্রবন্ধেও প্রচুরভাবে প্রভাব ফেলেছে। তিনি বঙ্কিমের মৃন্ময় ধাঁচের প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বীর রসকে মিশ্রিত করে নিজের এক ভিন্ন ধারা সৃষ্টি করেছেন। প্রবন্ধের এই ধারার তিনি একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর প্রবন্ধের ধারায় আরো অনেকের ছায়া পাওয়া যায়, যার মধ্যে সখারাম গনেশ দেউস্কর (১৮৬৯- ১৯১২) এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১- ১৯০৭) অন্যতম। এই বিশেষধারা সৃষ্টি করাটা তাঁর একধরণের কৌশলও বটে। নজরুল জানতেন যে,

বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতী। এদেরকে ভাবের সাগরে ডুবিয়ে রেখেই সবকিছু আদায় করে নিতে হবে। তাই, বস্তুগত প্রবন্ধকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি ব্যক্তিগত প্রাধান্যকেই নিজের হাতিয়ার বানিয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন ভাবের সাগর। যেখানে নিজের ইচ্ছেমত বেদনা, আশা, হাহাকার, বিদ্রোহ সবগুলোর রসকে মিশ্রিত করেছেন। আর এই রসই বাঙালির জন্য হয়েছিল সুধাসম।

নজরুল- প্রবন্ধের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশ। যেখানে ফুটে ওঠে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনার আলোচনা- সমালোচনা। এই ধরণের প্রবন্ধ দিন বদলের সাথে সাথে অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ২০ বছর আগের প্রবন্ধ আজকের দিনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। তাই এগুলোকে সাহিত্যের মধ্যে গণনা করা যায় না। কিন্তু নজরুল- প্রবন্ধ ভিন্ন। প্রায় শত বছর পুরনো লেখাগুলো আজো যেন তরুণ। তাই বলা হয়, Literature that does not last is journalism, journalism that lasts is literature. 'যে সাহিত্য টিকে না তা সাংবাদিকতা, আর যে সাংবাদিকতা টিকে তা সাহিত্য'। আর আমরা দেখতে পাই, নজরুলের সাংবাদিকতার অধিকাংশই টিকে গেছে। শুধু টিকে গেছে তা- ই না, আজ পর্যন্ত এগুলো জীবন্ত ও শাশ্বত। নজরুল- প্রবন্ধের শাশ্বত দিক সম্পর্কে ড. সুশীল কুমার গুপ্ত বলেন, "তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠগুণ যৌবনধর্ম, অন্তর্মুখী ভাববেগের অকৃত্রিমতা ও কাব্যধর্মী ওজস্বিতা। কোনো কোনো রচনায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাদর্শের বিবাহ বন্ধনে অসামান্য শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত। প্রধানত সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নজরুলের কতগুলো প্রবন্ধ যে সয়াময়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে আজও টিকে আছে তাতে অবশ্যই তাদের সাহিত্যগুণের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়[৪]।"

জাতির বিবেকখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল বলেন, "ধূমকেতুর সম্পাদক হিসাবে নজরুল যখন তাঁর অনলবর্ষী সম্পাদকীয় প্রবন্ধমালা রচনা করেন, তখন তা' একাধারে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ ভঙ্গির সবলতা এবং বিদেশী রাজ- শক্তির বিরুদ্ধে তরুণ সমাজের প্রচণ্ডতাকে সার্থক- ভাবেই রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিল[৫]।" ভাষার বহুল অলংকারিতা, ভাবোচ্ছ্বাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকতা এগুলোই নজরুল- প্রবন্ধের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। 'জাত প্রাবন্ধিক' হতে না পারার অন্যতম প্রধান কারনও এগুলোই।

কিন্তু নজরুলের এইসব ব্যবহার তাঁর সার্বভৌম কবিসত্তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। নজরুলের মত রবিন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও কবিসত্তা ভরপুর ছিল। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রাবন্ধিক বা প্রবন্ধ- বিজ্ঞানী নন, তিনি প্রবন্ধ শিল্পী। শিল্পীর থাকে রূপ- রচনার আবেগ ও কৌশল এই আগ্রহ ও কৌশল তিনি যে গদ্য রচনাগুলোতে রূপ দিয়েছেন, সেগুলোও তাই যথাবিধি শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে[৬]।" নজরুলের বেলায়ও আমরা ঠিক এই কথাটাই বলবো। তিনি জাত প্রাবন্ধিক বা প্রবন্ধ- বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন তুখোড় প্রবন্ধ শিল্পী।

তথ্যসূত্রঃ

১. সাহিত্য- সন্দর্শন- শ্রীশচন্দ্র দাশ।
২. প্রাগুক্ত।
৩. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিতমানস।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল- আনোয়ার পাশা।
৬. গদ্য- শিল্পী রবীন্দ্রনাথ- সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমণ কাহিনী

শেষ সম্রাটের দরবারে

মো. রেজাউল করিম

ইয়াঙ্গনে প্রথম যাই ২০০৯ সালে। বাল্যকালে স্কুলের পাঠ্য-বইয়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসের অংশবিশেষ 'সমুদ্র যাত্রা' পড়েছিলাম। সে গল্পে বার্মার রাজধানী জেনেছিলাম 'রেঙ্গুন'। হালে ভারত আর বার্মা মুলুকে ছোটো-বড়ো নানা শহরের নাম পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। ভারতে বোম্বে হয়েছে মুম্বাই, মাদ্রাজ হয়েছে চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর হয়েছে ব্যাঙ্গালুরু। মিয়ানমারের সামরিক সরকার জানা-অজানা উদ্দেশ্যে সেদেশের ২৬টি প্রদেশ ও শহরের নাম পরিবর্তন করেছেন। সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আমাদের চেনা-জানা রেঙ্গুন হয়েছে ইয়াঙ্গন, আরাকান হয়েছে রাখাইন স্টেট। আর আরাকানের রাজধানী আকিয়াব হয়েছে সিত্তে।

দাপ্তরিক কাজ। ইয়াঙ্গনে থাকতে হবে পাঁচ দিন। কোনো দেশে প্রথমবারের মতো যাওয়ার আগে সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করে যাওয়া আমার অভ্যেস। বার্মা মুলুকে নানা জাতি-গোষ্ঠী বসবাস করে। দেশটিতে বার্মিজ বা বর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এবং দেশের নাম এমনকি জাতীয়তাও তাদের নামেই হওয়ায় সেদেশের সামরিক সরকার অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জন্য সান্ত্বনা পুরষ্কার হিসেবে ১৯৮৯ দেশের নাম পাল্টে ফেলে। দেশের নামকরণ করা হয় 'ইউনিয়ন অব বার্মা'র পরিবর্তে 'রিপাবলিক অব দ্য ইউনিয়ন অব মায়ানমার'। মায়ানমার শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দ্রুত গতিসম্পন্ন ও শক্তিশালী জনগণ'। সেই সাথে রাজধানীর নামও রেঙ্গুনের পরিবর্তে ইয়াঙ্গন করে। সামরিক সরকার ২০০৬ সালে দেশের রাজধানী নবনির্মিত শহর নেপিটোতে নিয়ে যায়। রাজধানীতে সাধারণ জনগণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়। আমার ধারণা, গণআন্দোলন থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতেই সামারিক সরকার এই পদক্ষেপ নেয়।

এতে করে অবশ্যি শান, কারেন, কাচিন ও রাখাইন প্রদেশে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ হয়েছে তা কিন্তু মোটেও নয়। রাখাইনে অবশ্যি এই তৎপরতা খুবই সীমিত পরিসরে; শুধুমাত্র রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে। জাদুর বাক্স গুগলে গেলাম ইয়াঙ্গনে 'বেস্ট টেন টুরিস্ট সাইট' খোঁজার উদ্দেশ্যে। হতাশ হলাম- দশটা সাইটের মধ্যে পাঁচটা পেলাম

প্যাগোডা, একটি মিউজিয়াম, একটি চিড়িয়াখানা, একটি লেক, তিনটি বাজার (চায়না টাউনসহ)। কিন্তু শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর সম্পর্কে সেখানে কিছু পেলাম না। কিশোর বয়স থেকেই রাজনৈতিক ইতিহাস পড়াশোনায় আগ্রহ আমার। সেই সূত্রেই জানা, ১৮৫৭ সালে ব্যর্থ সিপাহী বিপ্লবের পরে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে তদানিন্তন রেঙ্গুনে বাধ্যতামূলক নির্বাসন দেয়া হয়। বাহাদুর শাহ জাফর সেখানে বন্দি অবস্থায়ই মারা যান। তাঁর সমাধি দেখার ইচ্ছায় মায়ানমার সম্পর্কিত গুগল লাইব্রেরিতে তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও হদিস পেলাম না। অবশেষে গুগল লাইব্রেরিতে বাহাদুর শাহ জাফর নামে কড়া নাড়তেই পেয়ে গেলাম। হাঁ, তাঁর সমাধি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। পড়লাম। কিন্তু আশ্চের্যের বিষয়, তাঁর সমাধির বিবিধ বিবরণ থাকলেও শহরের কোন সড়কে এর অবস্থান তা জানানো হয়নি।

বার্মা তথা মায়ানমার আমাদের প্রতিবেশী দেশ হলেও দেশটির সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর নয়। সে দেশের সামরিক সরকার মূলত চায়নার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে রাষ্ট্র হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথেও আদান- প্রদান রয়েছে। অভিন্ন সীমান্তে নিজ নিজ স্বার্থে ভারতের সাথেও সম্পর্ক জোড়দার। ইউরোপ- আমেরিকার অবরোধের কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক বেশ নাজুক। বাংলাদেশের তরফ থেকে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্যোগে ঘাটতি নেই। কিন্তু অজানা কারণে এ ব্যাপারে তারা মোটেও আন্তরিক নয়। চট্টগ্রাম থেকে আকাশপথে ইয়াঙ্গন মাত্র এক ঘণ্টার উড়াল পথ, ঢাকা থেকে বোয়িং বিমানে দেড় ঘণ্টার বেশি হবে না। চট্টগ্রাম তো দূরের কথা, ঢাকার সাথেও আকাশপথে সরাসরি যোগাযোগ তখন নেই। সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশ বেশ ক'বার প্রস্তাব দিয়েছে। এমনকি অর্থায়নও করতে চেয়েছে। তাদের অনাগ্রহের কারণে পরিকল্পনা থেকে 'পরি' উড়ে চলে গেছে; রয়ে গেছে 'কল্পনা'। অথচ টেকনাফের ওপারে রাখাইনের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা গেলে বাসে চেপে আমরা চীন দেশেও যেতে পারতাম।

আকাশপথে ভ্রমনে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। সড়কপথে যদি চীনদেশে যাওয়া যেত, আহা! কতবারই না যেতাম। মায়ানমার সরকারের সদিচ্ছার অভাবে সে গুড়ে বালি!

ভ্রমণ কাহিনী

মায়ানমার এদেশের ইতিহাসে আরও এক কারণে কুখ্যাতির দুর্নাম কুড়িয়েছে। সাবেক আরাকান, বর্তমান রাখাইন প্রদেশের মগ সম্প্রদায়ের কিছু দুষ্ট মানব নৌপথে চট্টগ্রাম অথবা নোয়াখালী, চাঁদপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত আসত লুণ্ঠনের জন্য। দু'তিন বছর পরে তারা একবার করে হানা দিত। থাকত এক থেকে তিন মাস। যাওয়ার সময় পাল তোলা শত শত জাহাজ ভর্তি করে ধান, চাল, অলংকার এমনকি গরু ছাগলও নিয়ে যেত। স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় তারা যা খুশি তাই করত। সে সময়ে তারা যে জেলায় অবস্থান করত সে অঞ্চলকে 'মগের মুল্লুক' বলা হতো। মোগল সুবাহদার শায়েস্তা খানই তাদের উৎপাত থেকে এদেশবাসীকে রক্ষা করেছিলেন। তবে মগের মুল্লুক কথাটি মানুষের চলতি ভাষায় এমনকি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

কী আর করা? যেহেতু ঢাকা- ইয়াঙ্গন ফ্লাইট নেই সেহেতু ব্যাংকক হয়ে যেতে হবে। কপাল সুপ্রসন্ন নয়। তিন দিনের ব্যবধানে ঢাকা- ব্যাংকক ফ্লাইটে টিকেট পাওয়া গেল না। সে সময়ে ব্যাংককে দিনে মাত্র দুটো ফ্লাইট ছিল। একটি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, অপরটি থাই এয়ারের। অগত্যা বিপুল ব্যয়ে সিঙ্গাপুর হয়ে যাত্রা ঠিক হলো।

প্রশাসন শাখার বাহাউদ্দিন তপাদার ভাই সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস এর টিকেট ধরিয়ে দিয়ে কৌতুকপূর্ণ চাহনীতে বললেন, 'যান, রাতের যাত্রা খারাপ হবে না। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস- এর কেবিন ক্রুদের মিষ্টি হাসিতে ঘুম এসে যাবে নিমিষেই।'

রাত বারোটায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৭৭- এ চড়ে বসলাম। চার ঘণ্টা পরে যখন দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরে নামছি তখন সেখানে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ভ্রমনপথে এ আমার জন্য বিব্রতকর এক বিড়ম্বনা- ঘুম আসে না। পুরোটা রাত কেটেছে নিদ্রাহীন। দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর। ছোটো-বড়ো ৬৩টি দ্বীপ নিয়ে সিঙ্গাপুর রাষ্ট্র। ১৯৬০ সালে এর আয়তন ছিল ৫৮২ বর্গকিলোমিটার। পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে মাটি কিনে এনে বেশ কিছু কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে বর্তমানে এর আয়তন বেড়ে হয়েছে ৭২০ বর্গকিলোমিটার। সে দেশের সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ আরও কিছু কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে আরও ১০০ বর্গকিলোমিটার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তবে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটিই বৃহত্তম দ্বীপ।

ভ্রমণ কাহিনী

তখন সুবহে সাদেক'র সময়। বড়ো দ্বীপটির চারপাশে সাগরে শত শত জাহাজ আলো জ্বালিয়ে চলাফেরা করছে। বিমানখানা আরও যখন নিচে নেমে এলো মনে হলো এ কোনো নগর নয়- বরং কম্পিউটারে তৈরি কাল্পনিক এক নগরের এক গ্রাফিক নকশা। বিস্তৃত সবুজের মাঝে সড়কগুলো যেন পেন্সিল দিয়ে টানা সরল রেখা। তারই মাঝে মাঝে অকাশচুম্বি অট্টালিকা।

বোয়িং ৭৭৭ নিরাপদে আমাদেরকে মাটিতে নামিয়ে দিল। এখানে আড়াই ঘণ্টা যাত্রা বিরতি। একটা সোফায় ল্যাপটপের ব্যাগটা মাথার নিচে দিয়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে পুরো দুই ডলার (সাকুল্যে ১৭০ টাকায়) দিয়ে এক কাপ চা আর এক টুকরো শুকনো কেক খেয়ে পেটের মধ্যে সৃষ্ট আচানক হৈচৈ থামালাম। সেখান থেকে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস এর সিস্টার কনসার্ন সিল্ক এয়ারে করে যেতে হবে ইয়াঙ্গন। পুনরায় চেক- ইন। প্যান্টের বেল্ট, পায়ের জুতো খুলে দীর্ঘ মানবসারিতে দাঁড়ালাম। ধীর পদক্ষেপে মানবসারি এগিয়ে যাচ্ছে। সাথে আমিও। এক সময় হ্যান্ডব্যাগ স্ক্যানিং পয়েন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোমরের বেল্ট ও জুতো বেশ নির্বিঘ্নেই স্ক্যানিং মেশিন পার হয়ে চলে গেছে। আমি ঘরের মধ্যেও চপ্পল পায়ে হাঁটা মানুষ। বিদেশ- বিভুঁইয়ে কোট- প্যান্ট পরে নগ্ন- পদে (মোজা অবশ্যি আছে) যারপরনাই লজ্জা অনুভব করছিলাম। নিজেকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে, সকলেই নগ্ন পদে হাঁটছে। এক গাঁয়ের সকলেরই যদি কান কাটা হয়, তাহলে একজনের জন্য আর সেটা লজ্জাজনক কিছু না- এই বলে মনকে প্রবোধ দিলাম।

কম্পিউটারের মনিটরে যে আপা- মনি ল্যাপটপের ব্যাগ স্ক্যানিং ইমেজের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি মোটেও সিঙ্গাপুর এয়ার- এর কেবিন ক্রুদের মতো মিষ্টি হাসিমুখো নন। বরং শিকারী বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো স্ক্যানিং চিত্রে কিছু আছে, এমনটি তিনি সন্দেহ করছেন। মনে মনে দোয়া- দরুদ পড়তে শুরু করলাম। বিপদে পড়লে কে- ই বা না পড়ে! মনে পড়ল ফরিদের কথা।

তখন ক্লাস সিক্স কী সেভেন- এ পড়ি। আরবি পাঠ্যে জের- জবর না থাকায় আমরা বুঝে পড়তাম না। মুখস্তই ছিল ভরসা। ফরিদ পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগী ছিল লাগামহীন। আরবি

ভ্রমণ কাহিনী

হুজুর সেদিন কেন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। ঠিকঠাক মতো উচ্চারণ করতে না পারলেই হাতে পড়ছে ডাস্টারের নিষ্ঠুর আঘাত। কাউকে দু'টো, কাউকে- বা দু'য়ের অধিক ডাস্টারাঘাতে জর্জরিত করছেন তিনি। ফরিদ আগের ক্লাসেও ডাস্টার এর ছোঁয়া পেয়েছে। হাতের তালু নিশ্চয়ই ব্যাথা। হুজুর ফরিদের কাছে যেতেই ফরিদ আবারও ডাস্টারের ছোঁয়ার ভয়ে থরথর কম্পমান। হুজুর বুঝে ফেললেন। হুজুর বললেন, 'এই তোর ঠোঁট নড়ছে কেন? ও বুঝেছি বাসায় পড়িসনি। এখন ভয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার দোয়া পড়ছিস। ঠিক না? মিথ্যে বলবি না। মিথ্যে বললে আজ তোর রেহাই নেই। খবরদার।'

ফরিদ নিতান্তই বোকা। মিথ্যে বললে হুজুর নিশ্চয়ই মনের খবর ধরত পারতেন না। সে স্বীকার করে ফেলল। হাউমাঁউ করে কেঁদে দিল ফরিদ। হুজুর অনুমানের ওপরে ভিত্তি করে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে ফরিদ বিপদ থেকে পরিত্রাণের দোয়া পড়ছিল। তাঁর অধিকতর জেরার মুখে ফরিদ স্বীকারোক্তি দিয়ে দিল-

'ডাস্টারাঘাতের ভয়ে সে দোয়া ইউনুস পাঠ করছিল।' সে যাত্রায় ফরিদ ডাস্টারাঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তবে চড়াঘাত থেকে রেহাই পায়নি।

কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসা আপা- মনির কপালের ভাঁজ অপসৃত হতে দেখলাম। কিন্তু একি! তিনি আমার ল্যাপটপের ব্যাগের সাইড- পকেট খুলে ভেতরে হাত চালান করে দিলেন কেন? ব্যাগের পকেটের মধ্যে হাতটি বেশ খানিকটা রগড়িয়ে বের করে আনলেন ভয়ঙ্কর এক মারনাস্ত্র- নেইলকাটার। দুনিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে কসম করে বলছি- কবে, কখন ওটা ল্যাপটপ ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলাম আমার মনে নেই। আপা- মনি নেইলকাটারটি চরম বিরক্তিভরা চেহারা নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে ব্যাগটি আমাকে ফেরত দিলেন। পেছন থেকে কে এক শ্বেতসাহেব 'ওউ' বলে উঠলেন। আমাকে যে পাকড়াও করা হলো না এজন্য ওপরওয়ালার দরবারে লাখো- কোটি শুকরিয়া জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

পূর্বদিন রাত্রি কেটেছে নির্ঘুম। সাতসকালে অবশ্যি সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। সিল্ক এয়ারের বিমান বত্রিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে থিতু হতেই নিদ্রাদেবীর আলতো পরশে চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। কিন্তু হা হতোশ্মী। বেরসিক কেবিন ক্রুর সুললিত কণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল।

ভ্রমণ কাহিনী

বিমান আকাশে উঠতে না উঠতেই প্রাতঃরাশ নিয়ে হাজির। হাতে ট্রে- তার মাঝে নানা পদের খাবারের আঞ্জাম। ঘুম আর হলো না। পুরো তিন ঘণ্টা পরে সিল্ক এয়ারের এয়ার বাস ইয়াঙ্গন বিমানবন্দরে নামিয়ে দিল। বিমানবন্দরের টার্মিনাল থেকে বেরুতেই দেখি লুঙ্গি ও সার্ট পরিহিত এক ব্যক্তি আমার অফিসের নামযুক্ত প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে নিতে এসেছেন। পরে জেনেছি, লুঙ্গি ও ওপরে সার্ট ইন্ করে পরাটা তাদের জাতীয় পোশাক।

বিমানবন্দর থেকে শহর খুব বেশি দূরে না- পাঁচ- ছয় কিলোমিটার। বিমানবন্দর ও শহরের সংযোগ সড়কের দু'পাশ খুবই মনোরম। ভবনগুলো বেশ দূরে দূরে। আকাশচুম্বী ভবন নয়- দোতলা কী তিনতলা। দু'পাশে সবুজের সমারোহ চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে আসে প্রশান্তি। রাস্তার মাঝে হলুদ রেখা দিয়ে সড়ক- বিভাজকের চিহ্ন রয়েছে। পরে দেখেছি গোটা শহরেই এমন। সড়কদ্বীপ দিয়ে ডিভাইডার করা হয়েছে, এমন সড়ক খুব কম। তবে এটি ভাবা ঠিক হবে না যে, ভিড় দেখলেই গাড়ি হলুদ রেখা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার ছুতো খোঁজে। না- তা করে না। শহরের কোথাও- ই ট্রাফিক পুলিশের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। সামরিক সরকার দেশের উন্নতি কতটুকু করতে পেরেছে জানি না। তবে শহরবাসীকে নাগরিক আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত করতে পেরেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শহরে রিকশা নেই, মটরবাইকও চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ঢাকায় সড়কদ্বীপে বিদেশী গাছ রোপন করে সবুজের ছোঁয়া আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা খুবই নাজুক। শীতকালে গাছগুলোর দৈন্যদশা বস্তিবাসীর হতদরিদ্র সন্তানটির মতোই হয়ে যায়। ঢাকায় বিমানবন্দর সড়কের দু'পাশে অপরিকল্পিতভাবে কোথাও বৃক্ষ, কোথাও ভাস্কর্য, কোথাও যুদ্ধজাহাজ কিংবা বিমানের রেপ্লিকা বসিয়ে নান্দনিকতার নামে যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করা হয়েছে- তা না নান্দনিক, না শিল্পিত ল্যান্ডস্কেপ।

আধঘণ্টার ব্যবধানেই নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছে গেলাম। আবারও ঘুম। দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্ন- ভোজ সেরে নিলাম।

হোটেল থেকে অফিস কাছেই- পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। আর এ শহরে আমার প্রিয় বাহন রিকশা যেহেতু নেই, সেহেতু হেঁটেই যেতে হবে। পথে দেখলাম সারিবদ্ধভাবে হেঁটে যাওয়া গেরুয়া পোশাক পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল। তারা কথা বলছে না, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনের হাতের

পিতলের ঘন্টি বাজছে। রাস্তার ধারে বিভিন্ন বাড়ি থেকে কেউ একজন থালা বা বাটি হাতে বের হয়ে ভিক্ষুদের পাত্রে খাবার ঢেলে দিয়ে গৃহভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে। পরে অফিসে স্থানীয়দের কাছে প্রশ্ন করে জানলাম বৌদ্ধ ধর্মশালায় অধ্যয়নরত তরুন ভিক্ষুরা মাসে দু'বার (সম্ভবত আমবস্যা, পূর্ণিমার দিন) সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনাশেষে খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়। সংগৃহীত খাবার ধর্মশালার সকলে ভাগ করে খায়। জিগ্যেস করলাম, 'খাবারগুলো তো পাত্রে পৃথক ভাবে রাখা হচ্ছে না। বিভিন্ন বাড়ি থেকে বিভিন্ন খাবার দেয়া হচ্ছে। একই পাত্রে ওগুলো তো 'সুপার খিচুড়ি' হয়ে যাচ্ছে?'

'সুপার খিচুড়ি কী?'

আগে তাকে বোঝালাম খিচুড়ি কী জিনিস? এবারে ভদ্রলোক সুপার খিচুড়ির পাঠোদ্ধার করতে পেরে বেশ হাসলেন। এবং যা বললেন, তার অর্থ হচ্ছে, ওই খাবার 'পবিত্র সংগ্রহ'। ওটা সুপার খিচুড়ি হোক আর যাই হোক, তাতে কোনো অতৃপ্তি আসে না।

মনে মনে বললাম, তা বটে!

অফিসে ঢোকার মুখেই অপেক্ষা করছিল আর এক বিস্ময়। অফিসের গেট পেরিয়ে মূল দরজার মুখে শ'খানেক জুতো- স্যান্ডেল। আমাকে নতুন দেখে প্রহরী জুতা খুলে অফিসে প্রবেশ করতে বললেন। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে একবার জুতো খুলেছিলাম। বার্মা মুলুকেও যে নগ্নপদে অফিসে ঢুকতে হবে, তা জানা ছিল না। জুতা আবিস্কার কবিতা কবিগুরু লিখে গেছেন। কিন্তু মোজা আবিষ্কারের গল্প লিখেননি। মোজা আবিষ্কার যেই করুন না কেন, তাঁর প্রতি সহস্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে মোজা পায়ে অফিসে প্রবেশ করলাম। মেনে নিলাম বহুল প্রচলিত প্রবাদ- বাক্য, 'যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার'। পরে জেনেছি, এটা এদেশের প্রথা। হালে কোনো কোনো অফিসে জুতো পরে হাঁটাহাটি অনুমোদিত হলেও বাসা- বাড়িতে একেবারেই না।

তবে পুরনো, এমনকি অনেক নতুন ভবনের মেঝেতেও সেগুন কাঠের টাইলস আমাকে বেশ বিস্ময়াভিভূত করেছে। এগুলো ওরা পানি দিয়ে মোছে না। কেননা পানি লাগলেই মূল্যবান সেগুনকাঠ নষ্ট হয়ে যাবে।

ভ্রমণ কাহিনী

পাঁচদিন কাটতে চলল নিদারুন ব্যস্ততায়। বিকেল গড়াতে না গড়াতেই সন্ধ্যে। এরপরে বিভিন্ন বাঙালীবাড়িতে নেমন্তেন্নে হাজিরা দেয়া। রাতে কোথায়ই- বা যাওয়া যায়। খুব ইচ্ছে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো স্বর্ণাচ্ছাদিত প্যাগোডা আর বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি দেখা- তা আর হলো না। রাতে বাঙালী- বাসাতে খাওয়া অবশ্যি আমার জন্য ছিল দিনের একমাত্র পরিপূর্ণ ভোজন। সারাজীবন সকালে রুটি- পরোটা খাওয়া মানুষ। হোটেলের রেস্টুরেন্টে ইংলিশ ডিশের ব্রেড, জ্যাম, জেলি, মাখন, জ্যুস- এ উদরপূর্তি হলেও মনের কোথায় যেন হাহাকার কাজ করে। আর দুপুরের বার্মিজ ডিশ, সে আরও বেদনাদায়ক।

এক হাফ প্লেটে থাকে পাতা- পুতি, শাক- সবজি। এর মধ্যে থাকে কাঁচা পুদিনা, থানকুনি, ধনে পাতা, শসা ও গাজর। ছোটো এক বাটি স্যুপ। হায়রে বার্মিজ স্যুপ। গোলমরিচের মিশেল দেয়া পানি- বাটির নিচে এক টেবিল চামচ সেদ্ধ সবজি- পেঁপে, লাউ বা পটল। সবশেষে প্রিয় ভাত এক বাটি পাওয়া যায় বটে, সাথে পাঁচমিশালী আধাসেদ্ধ সবজি।

ফলে রাতে বাঙালি বাড়িতে নেমতন্নে হাজিরা দেয়ার অর্থই ছিল যারপরনাই জান্নাতি খাবার। একটি কথা না বললেই নয়। ইয়াঙ্গন নদীর ইলিশ মাছ খেলাম। আমি চাঁদপুরের ইলিশের সাথে পাথর্ক্য খুঁজে পেলাম না। বার্মিজরা মাছ খায়। ইলিশও খায়। কিন্তু বাঙালি যেমন ইলিশের নাম শুনলেই হাউ- মাউ করে ওঠে, ওরা তেমন না। আর দশটা মাছ যেমন খায়, ইলিশও তেমনই খায়। এটা নিয়ে অতি উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত কিংবা উল্লসিত হতে দেখিনি ওদেরকে।

অবশেষে দুঃখ- ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পাঁচ দিন পরে আবারও মাথার পেছন দিয়ে নাক দেখানোর কায়দায় সিঙ্গাপুর হয়ে ঢাকায় ফিরে আসলাম। ঢাকায়ও অফিসের জরুরি কাজ রেখে গিয়েছি। যে কারণে পাঁচ দিনের আফিস অ্যাসাইনমেন্ট শেষে ছুটি নিয়ে দুটো দিন ইয়াঙ্গনে ঘোরার ইচ্ছে থাকলেও তা আর হলো না।

দ্বিতীয় দফা ইয়াঙ্গন গেলাম ২০১১ সালে। এবারে সাত দিনের অ্যাসাইনমেন্ট। এবারেও ঢাকায় অফিসের জরুরি কাজ রেখেই ইয়াঙ্গন ভ্রমন। তবে এবারে ব্যাংকক হয়ে। সে সময়েও ঢাকা- ইয়াঙ্গন সরাসারি ফ্লাইট চালু হয়নি। রাত বারটায় বাসা থেকে বের হলাম। ব্যাংকক এয়ারওয়েজের বিমানছাড়ল রাত তিনটায়। বিনিদ্র রজনী পার করে ব্যাংক পৌঁছলাম সেই ভোরে- ই।

রাতের অর্ধেকটা কেটে গেল ৩২ হাজার ফুট উঁচুতে এয়ারবাস নামের বায়ুযানে। নিশিকালে আকাশযাত্রার কারণ নাকি যাত্রীদের হোটেল ভাড়া বাঁচিয়ে দেয়া- তা বটে বেশ। ব্যাংকক থেকে আরও দেড় ঘণ্টা আকাশভ্রমন শেষে ইয়াঙ্গন পৌঁছে দুপুরের খাবার খেলাম। এবারে অফিসের কাছেই বেশ বড়ো আঙিনার ওপরে দোতলা এক কোরিয়ান হোটেলে থাকলাম।

হোটেল থেকে বের হতে মন চায় না। ভবনের পুরো অঙ্গনে সবুজের সমারোহ মনে যে প্রশান্তি এনে দেয় তা ছেড়ে বাইরে যেতে কারোর-ই হয়ত মন চাইবে না। হোটেলের রেস্টুরেন্ট, করিডর, ভবনের ছাদ সর্বত্রই ঘন সবুজ গাছ মন ছাড়িয়ে শরীরকেও আবেশিত করে তোলে।

অফিসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে স্থানীয় দুই তরুণ-তরুণীকে নিয়ে বিকেল নাগাদ শহর দেখতে বেরোলাম। গতবারেই ওদের সাথে পরিচয়। আগেই সমঝোতা করে নিলাম ট্যাক্সিতে নয়, যতটুকু পারি হেঁটেই শহরটা দেখার চেষ্টা করব। তখনও বিকেল। সন্ধ্যা হতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি। ঘণ্টা দেড়েকের পদভ্রমণে খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা দোতলা ভবনগুলোকে অক্ষত রেখেই শহরের বৃদ্ধি ঘটেছে। কলকাতার বেশ কয়েকটি রাস্তা রয়েছে যেসব রাস্তায় হাঁটলে মনে হয় বুঝি-বা আঠার কিংবা উনিশ শতকের শহরে হাঁটছি। ইউরোপও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে ব্যতিক্রম ঢাকা। পুরনো ঐতিহ্যবাহী ভবন পুরনো ঢাকাতেও তেমন আর চোখে পড়ে না। ঐতিহ্যের শেকড় উপড়ে ফেলতে আমরা যেন বদ্ধপরিকর।

একদিন ইয়াঙ্গন জেনারেল হাসপাতালের পরিচালকের সাথে আলাপচারিতায় তিনি জানালেন, একশ বছর আগে নির্মিত হাসপাতালের পুরাতন ভবনটি রেট্রোফিটিং করে স্থায়ীত্বশীলতা বাড়ানো হচ্ছে। আর বর্ধিত চাহিদার পেক্ষিতে পুরাতন ভবনের পেছনেই নতুন ষোলো তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলাম। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের আদি ভবনটি ভেঙে সেখানে নতুন বহুতল ভবন নির্মানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও এ ব্যাপারে যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

পথেই পড়ল চায়না টাউন। নামে চায়না টাউন হলেও ছোটো একটি রাস্তায় বেশ কয়েকটি ভবন মাত্র। ভবনগুলো চায়নিজ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। চীনা অধিবাসীদের কম্যুনিটি সেন্টারে চোখ

ধাঁধানো আলোকসজ্জা। কাছে যেতেই বোঝা গেল তাদের নিজস্ব কোনো পার্বনের উদ্যাপন চলছে। উচ্চশব্দের বাজনার সাথে মান্দারিন ভাষায় একটার পর একটা গীত পরিবেশিত হচ্ছে। সাথে তরুণ- তরুণীদের উদ্বাহু নৃত্য। উচ্চশব্দে আমি স্বস্তি অনুভব করি না। দ্রুত সেখান থেকে নিস্ক্রান্ত হলাম।

ফেরার পথে ওদের দু'জনকে কিছু খাওয়ার কথা বললাম। ওদের পছন্দেই ছোটো একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। ততক্ষণে ওদের রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে। ওদেশে দুপুর ও রাতের খাবারের সময় আমাদের সাথে মেলে না। দুপুরের খাবার বারটায়, আর রাতের খাবার সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটা।

তিনজনের জন্য ফুলপ্লেট ফ্রাইড রাইস আর মিক্সড ভেজিটেবল অর্ডার দেয়া হলো, সাথে ফিস ফ্রাই। চটপটে সুদর্শন খিদমতগার পনের মিনিটের ব্যবধানেই কাঙ্খিত খাবার দিয়ে গেলেন। এ ক'দিনে বাঙালি বাসায় সুস্বাদু মাছ খেয়েছি। কিন্তু তবিয়ত খারাপ হলে যা হয় আর কী। এখানে ফিস ফ্রাই কেন যেন তিতকুটে লাগল। মিক্সড ভেজিটেবল মানে নানা পদের আধা সেদ্ধ সবজি, সবজির ওপরে মুক্তহস্তে সস্ দেয়া। শুধু ফ্রাইড রাইস খেয়ে উদরপূর্তি করতে চেয়েছিলাম। ওদের চাপাচাপিতে সস্ মাখানো আধা সেদ্ধ সবজিও প্লেটে তুলে নিলাম। কচকচ করে চিবিয়ে খেলামও।

এবারে বার্মা মুলুকে থাকতে হবে সাত দিন। মাঝে এক রবিবার ছুটি আছে। কিন্তু যথারীতি দুপুরে আহাদ ভায়ের বাসায় নেমন্তন্ন। সুখকর যন্ত্রণা। কী- ই বা করা! যেতে হবেই। উনিই আমার স্থানীয় অভিভাবক। ওনাকে মনের গহীনে লালিত বহুদিনের আকাঙ্খার কথা জানালেম- এ যাত্রায় মিস করতে চাই না। আমি আগামীকাল বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি দেখতে যাবই। সমাধিসৌধের অবস্থানটা জানা দরকার। এখানে ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়া বেশ কম। আমার বাংলাদেশী সঙ্গী যাবেন না। উনি প্রাচীন দ্রব্যাদির সংগ্রাহক। দেশ- বিদেশে থেকে এগুলো সংগ্রহ ও ক্রয় বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অথচ এমন একটি সুযোগ হেলায় হারাচ্ছেন- বেশ অবাক হলাম।

বিস্মিত হলাম গোটা অফিসের জনা দশেক স্থানীয় কর্মকর্তা বেশ তকলিফ করেও কেউ- ই কাঙ্ক্ষিত সমাধির হদিস দিতে পারলেন না। দু'একজন অফিসের দেয়ালে ঝুলানো ইয়াঙ্গন শহরের

মানচিত্রের কাছে ছুটে গেলেন, তালাশ করলেন, গভীর মনযোগ সহকারে তালাশ করলেন। কিন্তু ফলাফর তথৈবচ। অবশেষে যিনি সমাধি- সৌধের হদিস দিতে পারলেন তিনি ভারতীয় বংশদ্ভূত একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। সমাধিসৌধটি বৃহত্তম স্বর্ণমণ্ডিত শোয়েডাগন প্যাগোডার কাছেই- পূর্বপাশে উইসারা রোডের জিওকা স্ট্রিটে।

ভারত সরকারের অর্থায়নে বাহাদুর শাহ'র মাজারটি বেশ চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। মাজার কমপ্লেক্স- এ তার নামে একটি সভাকক্ষও রয়েছে। মাজারে প্রবেশ করতেই হাতের ডান পাশে বাহাদুর শাহ'র নামাঙ্কিত সভাকক্ষটির সামনেই রয়েছে বাহাদুর শাহ জাফরের বেশ বড়ো আকারের পোট্রেট। মাজারের ভেতরের দেয়োলগুলোতেও রয়েছে বাঁধাই করা নানা ছবি। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তোলা একটি ছবিও রয়েছে। বাহাদুর শাহ তখন পক্ষঘাত- রোগে আক্রান্ত। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে খুবই ক্লান্ত ও বির্মষ।

এই কমপ্লেক্সে বাহাদুর শাহের দুই ছেলের ছবিও রয়েছে। রয়েছে তৃতীয় স্ত্রী বেগম জিনাত মহলের ছবি। মাজার প্রাঙ্গণে গেলে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। কী এক অজানা রহস্যে হৃদয় উদ্বেলিত হয়। টেনে নিয়ে যায় কল্পনার মোগল- জগতে।

প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের ইচ্ছানুসারে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে কাবুলে। দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে দাফন করা হয়েছে দিল্লীর সন্নিকটে সিকান্দ্রায়। তৃতীয় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সমাহিত করা হয়েছে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে লাহোরে। চতুর্থ মোগল সম্রাট আকবরকে সমাহিত করা হয়েছে আগ্রার সন্নিকটে মোগলদের স্বল্পকালীন রাজধানী ফতেহপুর সিক্রীতে। পঞ্চম মোগল সম্রাট শাহজাহানকে সমাহিত করা হয়েছে তাজমহলে তাঁর স্ত্রীর পাশে। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ ও ষষ্ঠ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সমাহিত করা হয়েছে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে মহারাষ্ট্রে তাঁর শিক্ষাগুরু শেখ জৈনউদ্দিনের সমাধির পাশে। সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন ১৭০৭ সালে। এর পরে বাহাদুর শাহ জাফরের মধ্যবর্তী সময়ে দিল্লীতে আরও দশ জন মোগল সম্রাটের অস্তিত্ব ছিল। তাদের সমাধি কোথায় সে খবর নেইনি।

কিন্তু দিন যতই এগিয়েছে মোগল সাম্রাজ্য ততই ছোটো হয়েছে। ১৭৩৯ সাল পারস্য অধিপতি নাদির শাহ দিল্লী দখল করে দুই মাস অবস্থান করেন। তিনি দিল্লী দখল করলেও মোগল সম্রাটকে হত্যা করলেন না। হত্যা করলেন দিল্লীর ৩০, ০০০ বেসামরিক মানুষকে। ফিরে গেলেন ১০ হাজার ঘোড়া, ৩০০ হাতি, মণকে মণ সোনা রূপা আর বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন নিয়ে। মোগল পিদিমে রেড়ির তেল আর রইল না কিছুই। ক্রমেই প্রদেশগুলো স্বাধীনভাবে চলতে শুরু করল।

বাবর, জাহাঙ্গির ও আওরঙ্গজেব বাদে ৩ দৌর্দণ্ড প্রতাপশালী মোগল সম্রাট হুমায়ুন, আকবর ও শাহাজাহানের সমাধি দেখেছি। আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁদের সকলের সমাধিসৌধ অনন্য স্থাপত্য- সৌকর্যের দুর্লভ নিদর্শন। কিন্তু বিদেশ- বিভুঁইয়ে নির্বাসিত শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধি- সৌধ নিতান্তই সাদামাটা কোনো পীর- মুর্শিদের মাজারের মতোই।

কিন্তু সিমাধিসৌধের ভূর্গভস্থ তলায় চমৎকার এক ঝাড়বাতির নিচে বাহাদুর শাহের সমাধি। উপরের তলায় তার স্ত্রী ও দুই ছেলের সমাধি। সমাধিসৌধে ঢোকার আগে ভাবছিলাম সেলামি দিতে হবে কি না? আমার কাছে স্থানীয় মুদ্রা নাই।

না। এখানকার মাজারে সেলামি- নজরানা নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। ইয়াঙ্গনের কিছু মুসলিম নারী- পুরুষ সমাধিসৌধের ভেতরে বাহাদুর শাহের স্ত্রী ও ছেলেদের কবরের পাশে বসে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করছেন। তেলওয়াত- শেষে মোনাজাত করে যে যার মতো চলে যাচ্ছেন। তবে কবরের পাশে দেয়ালে কিছু ছবি বাঁধাই করে রাখা হয়েছে। বড়ো ছবিটি সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের- রাজকীয় বেশে বসে আছেন তিনি। ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক আমাদের দেশের মাজারে অবশ্য ছবির প্রদর্শন দেখা যায় না।

ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। একটি ছবিতে চোখ আটকে গেল। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, সমবেত জনতার মাঝে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে দিল্লীর রাস্তায় হাতকড়া পরিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। খুব কষ্ট হলো। অপমানিত বোধ করলাম। ভগ্ন হৃদয়ে বের হয়ে আসলাম।আবারও সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সম্রাটের কবরের পাশে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভ্রমণ কাহিনী

ভাবছিলাম ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে এই মহামহিম চুড়াশি বছর বয়সে কত না অপমান ও কষ্ট সহ্য করেছেন।

বাহাদুর শাহের একটি লেখা তাঁর এপিটাফে খোদাই করে রাখা হয়েছে,

"কিতনা বাদ নাসিব জাফার দাফান কে লিয়ে
দো'গাজ জামিন ভি না মিলি কু-এ ইয়ার মেঁ"

অর্থঃ হে জাফর(কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন), তুমি কতই না দূর্ভাগা, দাফনের জন্য প্রেমাস্পদের গলির দুই গজ জমিনও নসিব হলো না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিসহ উচ্চপদস্থ কেউ মায়ানমারে এলে তাঁরা বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য পেশ করেন। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আশির দশকে মিয়ানমার সফরে গিয়ে তাঁর সমাধি ফলকে লিখে এসেছেন, "দো'গজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্তান মে, পার তেরী কোরবানী সে উঠি আজাদী কি আওয়াজ, বদনসীব তো নাহি জাফর, জুড়া হ্যায় তেরা নাম ভারত শান আউড় শওকত মে, আজাদী কি পয়গাম সে।"

যার বাংলা অর্থ:

'হিন্দুস্তানে তুমি দু'গজ মাটি পাওনি সত্য। তবে তোমার আত্মত্যাগ থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিল। দুর্ভাগ্য তোমার নয় জাফর, স্বাধীনতার বার্তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সুনাম ও গৌরবের সঙ্গে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।'

বাহাদুর শাহের পূর্ণ নাম আবুল মুজাফফার সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ গাজী। তিনি ২৪ অক্টোবর ১৭৭৫ সালে দিল্লীর লালকেল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-৩৭) ও সম্রাজ্ঞী লাল বাঈর দ্বিতীয় পুত্র তিনি।

বাহাদুর শাহ সিংহাসনে আরোহণের ২০ বছর পর ঐতিহাসিক সিপাহি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পলাশী যুদ্ধের পর একশ বছর কেটে গেছে তত দিনে। ছলে বলে কৌশলে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানি সমগ্র ভারত উপমহাদেশ দখল করে নিয়েছে। কোনো কোনো রাজ্যের নবাব ও রাজা অবশ্য সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়াই বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে রাজ্যে কোনো রকমে নিজ অস্তিত্ব ধরে রেখেছেন। দেশবাসীর সাথে সৈন্য বিভাগের লোকদের ওপরও চলছে জুলুম, বঞ্চনা ও নির্যাতন। একের পর এক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ অধিকারে নিয়ে যাওয়া, লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, কারাগারে হিন্দু- মুসলমান সিপাহিদের জন্য একই খাবারের ব্যবস্থা, গরু ও শূকরের চর্বি- মিশ্রিত কার্তুজ বিতরণ ইত্যাদি ভারতের জনমনে ও সৈনিকদের মনেও ব্যাপক নেতিবাচক ব্যাঞ্জনা তৈরি করে।

বৃটিশ- ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের মধ্যে মনোভাব তৈরি হয়। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর সেনাছাউনিতে ২৫- ২৬ ফেব্রুয়ারি। বৃটিশ- ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতীয় সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সিপাহিরা কার্তুজ নিতে অস্বীকার করে। রাতে অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙে পুরনো মাসকেট বন্দুক ও কার্তুজ সংগ্রহ করে। সে সময়ে তারা ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। ধূর্ত ইংরাজ সেনা কর্মকর্তাবৃন্দ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে সিপাহিদের নিরস্ত্র করে ফেলে।

এই সংবাদও দ্রুত পৌঁছে যায় বিভিন্ন সেনানিবাসে। ২৯ মার্চ রোববার বারাকপুরের দেশীয় সিপাহিরা বিদ্রোহ করে। মঙ্গল পান্ডে নামের এক সিপাহি গুলি চালিয়ে ইংরেজ সার্জেন্টকে হত্যা করে। বিচারে মঙ্গল পান্ডে ও তাকে সহায়তার অভিযোগে জমাদার ঈশ্বরী পান্ডেকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ৮ এপ্রিল সকাল ১০টায় তাদের ফাঁসি দেয়া হয়। এর পরিণতিতে সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতের উত্তর থেকে মধ্যপ্রদেশ এবং জলপাইগুড়ি থেকে পূর্ববাংলার দক্ষিণ- পূর্ব কোণের চট্টগ্রাম পর্যন্ত। ৯ মে উত্তর প্রদেশের মিরাটের সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লির পথে অগ্রসর হন। ১১ মে সিপাহিরা দিল্লী অধিকার করে বহু বৃটিশ নাগরিককে হত্যা করে, কিছু পালিয়ে যায়। দেশপ্রেমিক সিপাহিরা এদিন গভীর রাতে লালকেল্লায় প্রবেশ করে একুশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে ৮২ বছরের বৃদ্ধ বৃটিশ পেনশনভোগী শুধুমাত্র উপাধি- সর্বস্ব মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করে। সে রাতেই সিপাহিরা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ভারতকে ইংরেজমুক্ত করে স্বাধীনতার শপথ নেন।

ভ্রমণ কাহিনী

নামে সম্রাট হলেও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের কোনো সাম্রাজ্য ছিল না। পিতার মতোই বাহাদুর শাহ জাফর ব্রিটিশ পেনশন নিয়ে লালকেল্লার ভেতরে অলস জীবন- যাপন করছিলেন তখন। পিতার মতো তিনিও নিজের ও মোগল খান্দানের ভরণপোষণের ভাতা বৃদ্ধির জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ‘বাদশাহ’ উপাধি ত্যাগ এবং লালকেল্লার বাইরে সাধারণ নাগরিকের মতো জীবনযাপনের শর্তে রাজি হননি। এ ছাড়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নিয়েও ইংরেজদের সাথে সম্রাটের মনোমালিন্য চলছিল। সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা খর্ব করতে নানা উদ্যোগ নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এ সময়ে অমর্যাদার মনোবদেনা ভুলে থাকার জন্য তিনি গজল ও কবিতা রচনায় নিমগ্ন হন। লালকেল্লায় সহিত্যের আসর বসিয়েও সময় কাটাতেন। জীবনের কষ্ট ও বিষাদই ছিল তাঁর কবিতার মূল বিষয়। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে দুঃখ ও বিষাদের সাথে দেশ ও জাতির পরাধীনতার কথাও বিধৃত। একটি কবিতায় লিখেছেন:

“উমর এ দারাজ মাঙ্গকে লায়ে থে চার দিন,
দো আরজু মে কাট গায়ে, দো ইন্তেজার মে।"

যার র্অথ “চার দিনের জন্য আয়ু নিয়ে এসেছিলাম। দু’দিন কাটল প্রত্যাশায় আর দু’দিন অপেক্ষায়।”

তাঁর আর একটি কবিতাও বিষাদময়। তিনি লিখেছেন:

‘ইয়া মুঝে আফসার- ই- শাহানা বানায় হোতা,
ইয়া মেরা তাজ গাদায়ানা বানায়া হোতা’

You should Have made me the chief of the kings or
Instead you should have given me a crown that a begger may wear

আমায় তুমি বানাতে ওগো রাজাদের রাজা
নয়তো তুমি দিতে আমায় ভিখিরীর মুকুট

শাহজাদারা তখন কেউ বসে খায়। কেউ- বা ব্যবসায়- বাণিজ্য করে। মোগল শাহজাদাদের বুদ্ধিমত্তা, সাহস, শৌর্য সবই তারা হারিয়েছে। বাহাদুর শাহ জাফরের নিষেধ সত্ত্বেও মোগল শাহজাদাদের নেতৃত্বে দিল্লীতে বেসামরিক ইংজেদেকেও হত্যা করা হলো। সম্রাটের ব্যক্তিগত

চিকিৎসক বিশ্বসঘাতকতা করে লালকেল্লার সকল পরিকল্পনা ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিতে থাকল।

বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহিদের বিপ্লব তথা ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এ সংবাদে কানপুর, লক্ষৌ, বিহার, ঝাঁশি, বেরিলি থেকে শুরু করে পশ্চিম ও পূর্ববাংলার সর্বত্র সিপাহিরা গর্জে ওঠে। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না। কিন্তু তারা জানত না যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ব্যবসায় ও সাম্প্রদায়িতকার ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন না।

বিপ্লবী সৈন্যরা এক মাস যেতে না যেতেই সম্রাটের কাছে বেতন দাবী করে বসল। এত সৈন্যের বেতন সম্রাট দিবেন কোথা থেকে? পেনশনের টাকায় তো তাঁর নিজের সংসারই চলে না। বাহাদুর শাহ নিকটস্থ ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের কাছে অর্থ- সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলেন। রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের কেউ- ই সম্রাটের ডাকে সাড়া দিলেন না। দিবেন- ই বা কেন? মোগল যুগে তাঁরা শুধু জমিদারী থেকেই অর্থ উপার্জন করতেন। এখন তাঁরা ইংরেজদের সাথে বাণিজ্য করে বিপুল টাকা উপার্জন করছেন। মোগলরা ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া থেকে আসলেও তারা কখনো ভারতের সম্পদ তাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে নিয়ে যায়নি। ইংরেজরা স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের সাথে বাণিজ্য করে সস্তায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ কিনে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের কাছে মোগল শাসন অপেক্ষা ইংরেজ শাসন ছিল লাভের। জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুরের রাজারা অর্থ ও সৈন্য- সামন্ত দিয়ে ইংরেজদেরকেই সহযোগিতা করল। আর রাজপুত, মারাঠারা তো কোনোদিনই মোগলদেরকে মেনে নেয়নি। তারাও ইংরেজদের পক্ষেই লড়াই করল।

বাহাদুর শাহ জাফর স্ত্রীর অলংকার, সঞ্চিত সামান্য মূল্যবান রত্নরাজি, এমনকি আসবাবপত্রও বিক্রি করে সৈন্যদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সবই বিফলে গেল।

১১ মে তারিখে বিপ্লবের যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল দুই মাস দশ দিন পরে ব্রিটিশ বাহিনীর দিল্লী পুনর্দখলের মধ্য দিয়ে সিপাহী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। অবশেষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইংরেজরা দিল্লী দখল করে নেয় এবং ২১ সেপ্টেম্বর সম্রাট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

ভ্রমণ কাহিনী

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দিল্লী থেকে পালিয়ে পাঞ্জাব হয়ে দুর্গম খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে কাবুল অবধি গেছেন। সেখান থেকে সৈন্য- সামন্ত যোগাড় করে ফিরে এসে আবারও দিল্লী দখল করেছেন। আর বাহাদুর শাহ জাফরের শাহাজাদাগণ দিল্লীতে পরাজিত হয়ে দিল্লীর কাছেই সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিসৌধে আশ্রয় নিলেন।

ইংরেজ সৈন্যরা অল্প সময়েই সেখানে হাজির হয়। তারা মোগল শাহজাদাদেরকে বিনা প্রতিরোধে প্রেপ্তার করে। বন্দি অবস্থায় ২৯ জন মোগল শাহজাদাসহ বহু আমির ওমরাহ, সেনাপতি ও সৈন্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তারা। বাহাদুর শাহ জাফরের ৩ পুত্রকে জনসমুখ্যে দিল্লী গেটের সামনে গুলি করে হত্যা করে। (অপর ২ কিশোর পুত্রকে হত্যালীলা থেকে অব্যাহতি দেয়)। নিহত শাহজাদাদের ছিন্নমস্তক- দেহ হুমায়ুনের সমাধিসৌধ থেকে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে আসে। দিল্লীতে শাহজাদাদের ছিন্নমস্তক- দেহ দিল্লীতে এনে সম্রাটকে দেখতে বাধ্য করা হলো। সম্রাটকে বিচারের নামে প্রহসনের আদালতে দাঁড় করানো হয়। হাজির করা হয় বানোয়াট সাক্ষী। বিচারকরা রায় দেন, দিল্লীর সাবেক সম্রাট ১০ মে থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠনের দায়ে প্রধান অপরাধী। তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে তার বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে প্রাণ দণ্ডাদেশ রহিত করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর ৮৩ বছরের বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল, দুই কিশোর শাহজাদা, ও ভৃত্যদের নিয়ে ইংরেজ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনী দিল্লী ত্যাগ করে। ৯ ডিসেম্বর জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছে। ব্রিটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিসের বাসভবনের ছোট্ট গ্যারেজে সম্রাট ও তার পরিবার- পরিজনের বন্দিজীবন শুরু হয়। সম্রাটের শয়নের ব্যবস্থা করা হলো পাটের দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায়। ভারতের প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে রেঙ্গুনের মাটিতে সম্রাটের জীবনের বাকি দিনগুলো চরম দুঃখ ও অভাব অনটনের মধ্যে কেটেছিল। সম্রাট পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন।

এক বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের অবসান হয় ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর, শুক্রবার ভোর ৫টায়। তবে সম্রাটকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে দাফন করা হয়। কবরটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য একসময় সম্রাটের কবরের স্মৃতি মুছে যাবে। রেঙ্গুনের বৃষ্টিবিধৌত সবুজ ঘাস কবরের চিহ্ন আচ্ছাদিত করে ফেলবে। কোথায় সর্বশেষ মুঘল সম্রাট শায়িত আছেন, তার চিহ্নও যেন কেউ খুঁজে পাবে না।

এখন যেখানে বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধিসৌধ ঐ এলাকাতে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা মেরামতের সময় ১৯৯১ সালে তার আসল কবর আবিষ্কৃত হয়। ভারত সরকারের উদ্যোগ ও অর্থায়নে পরবর্তীতে সেখানে সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্পিল, যিনি 'লাস্ট মুঘল' বইয়ে লিখেছেন **"জাফর একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামী শিল্পরীতিতে পারদর্শী, তুখোড় কবি এবং সুফি পীর জাফর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে গভীর গুরুত্ব দিতেন। জাফর কখনও নিজেকে বীর বা বিপ্লবী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, তাঁর ব্যক্তিত্বও সে ধরনের ছিল না, কিন্তু তাঁর পূর্বপরুষ সম্রাট আকবরের মতো তিনিও ইসলামী সভ্যতার একজন আদর্শ প্রতীক ছিলেন, যে সময় ইসলামী সভ্যতা তার উৎকর্ষে পৌঁছেছিল এবং সেখানে পরমতসহিষ্ণুতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে।"**

বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধির সামনে বেশ কিছুক্ষন একাকী নিরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। হৃদয়ে তখন উথাল- পাথাল। কেন যেন মনে হচ্ছে, আমিও পরাজিত সৈনিক। পরাজয়ের গ্লানিতে আমি ম্রিয়মান। মানসপটে বিচিত্র এক অনুভূতি কাজ করছে আমার মধ্যে। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব বুঝি- বা দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছেন। হুমায়ুনের সমাধিসৌধে মোগল শাহজাদাদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ইংরাজ সাহেবরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। গুলি করছে একর পর এক। স্বাধীনতাযোদ্ধাদের লাশের রক্তে সমাধিসৌধের প্রাঙ্গন ভেসে যাচ্ছে। হুমায়ুন দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে অবিরাম।

পরাজয়ের গ্লানি আর স্বাধীনতার ঔদ্ধত্ব আমার হৃদয়ে জন্ম দেয়- ক্রোধ। বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করেছে। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নয়- সসম্মানে। সেখানেই আমার ক্ষোভ। আমেরিকা যেমন ভিয়েতনাম থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পালিয়েছে, পকিস্তান পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বন্দি অবস্থায় ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু গ্লানি থেকে ধূর্ত বৃটিশ জাতি রেহাই পেয়েছে।

ভ্রমণ কাহিনী

আমি ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে আমি সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স থেকে। গেটের বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষমান। আজ রাতে আহাদ ভাইয়ের বাসাতেই খাওয়ার কথা। যেতে মন চায় না। ড্রাইভারকে বললাম, হোটেল ক্লোভার ইন।

হোটেলে রিসেপশন থেকে ফোন করে আহাদ ভাইকে জানিয়ে দিলাম, আজ লেখালেখির কাজ আছে। তাই যাব না। আহাদ ভাই হাঁ হাঁ করে উঠল। ভাবী নাকি আমার জন্য দই বসিয়েছে। সেদিনকার মতো মাফ চেয়ে নিলাম। ভালো লাগছিল না।

লেখক-
মো. রেজাউল করিম
স্নাতকোত্তর- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান (প্রথম শ্রেণি, ১৯৮৮)
প্রকাশিত বই- **ভাষা আন্দোলনে ফরিদপুরে** ও **ইতিহাস ও স্থাপত্য ঐতিহ্যের নগরী ঢাকা**সহ আরো ১৪টি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ - **'তোমার খোঁজে।'**

গদ্য

স্মৃতিবিলাস

জিনাতুননেছা জিনাত

মানুষ স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বড্ড ভালোবাসে, নিজেকে কষ্ট দিয়ে হলেও প্রায় প্রত্যেক মানুষই এক জীবনে তার মস্তিষ্কের কুঠুরিতে হাজারও স্মৃতি জমিয়ে রাখে।

মা মারা যাবার তিনদিন পর আব্বা আমাদের ভাইবোনদেরকে ডেকে বললেন, "তোমার মায়ের তো আলাদা বলে তেমন কোন কিছুই ছিল না, টাকা- পয়সা বা গহনাগুলো আমার বড় স্টিলের আলমারীতেই রাখতো । তবে শো- কেসের একটা ড্রয়ারে সে তালা দিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রাখতো সবসময়, আমিও জানিনা সেখানে কী আছে । তবে আমি চাই তোমাদের সবার সামনে ড্রয়ারটি খুলতে।"

আমাদের সবার মুখ থমথমে, চোখের পানি শুকায়নি এতটুকুও, বুকের ভেতরে দগদগে ক্ষত! মায়ের সাথে আর কোনদিন দেখা হবে না, এই একটি কথা মনে পড়লেই মরে যেতে ইচ্ছে করে, সেখানে মায়ের পড়ে থাকা জিনিসে কারোরই কোন আগ্রহ নেই, তবুও আব্বার কথামতো সবাই স্ট্যাচুর মতো বসে রইলাম । আব্বা ড্রয়ার খুলে একটা একটা করে জিনিস বের করতে শুরু করলেন- আমার স্কুল জীবনের বেগুনী- সাদা ডোরাকাটা জর্জেটের একটা কলিদার ফ্রক, যে জামাটাকে আমি বাতিল করেছি অন্তত পনের বছর আগে, শিক্ষাজীবনে পোস্ট কার্ডে ইনভেলাপে করে পাঠানো মাকে আমার লেখা অনেকগুলো চিঠি, আমার ছোট ভাইয়ের স্কুল ড্রেস, অথচ ও তখন সম্ভবত অনার্স শেষবর্ষের ছাত্র, মায়ের সেলাইয়ের রঙ বেরঙের সুতার গুটি, ক্রিমের কৌটায় যত্নে রাখা ছোট- বড় সূঁচ...আর সহ্য করতে পারছিলাম না । আমরা, সবার ছোট দুই ভাই- বোন বাড়ি থেকে বেশি দূরে থাকতাম, অন্য ভাইবোনেরা একই শহরে থাকায় তাদের সাথে মাঝেমাঝে মায়ের দেখা হবার সুযোগ ছিল । তাই হয়তো মা নিজের স্মৃতির আঙিনায় আমাদেরকে সর্বক্ষণ ওভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

মেয়ের জন্য আলমারী থেকে তোয়ালে বের করতে গিয়ে ঝকঝকে একটা তোয়ালে সামনে এলো, হাতে নিয়ে ফিরে গেলাম প্রায় পঁচিশ বছর আগে ।

আমার রুমমেট ছিল মুন্নী, ওর ঘনিষ্ট বান্ধবী মুন্না, নামে যেমন মিল ছিল দু'জনের তারচেয়ে বেশি মিল ছিল ওদের আত্মায় । অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় মুন্নীর আকস্মিক বিয়ে হয়ে যায়, তার কিছুদিন পরে মুন্নারও । অনার্স পরীক্ষার আগে মুন্নাদের পরিবার খুলনা থেকে ঢাকায় শিফট করে, ফলে পরীক্ষার সময় মুন্নার থাকার মতো তেমন কোন জায়গা ছিলো না, যেহেতু আমার রুমমেটের প্রিয় বান্ধবী, তাই মেট্রন আপাকে বলে আমার রুমে ওর সাময়িক থাকার ব্যাবস্থা করেছিলাম ।

মুন্না আট ভাইয়ের একটাই বোন, বড্ড আদুরে ছিল ওর কন্ঠস্বর । প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা ছোট্ট স্টিলের মগে দুধ চা খেত মুড়ি দিয়ে । একদিন ব্যাগ থেকে দুটো তোয়ালে বের করে বললো, একটা তোর আর একটা মুন্নীর জন্য এনেছি, কোনটা নিবি? আমি হেসে বললাম- মুন্নীর মেয়ে হয়েছে, ওকে বড়টাই দিয়ে দে, আমি ব্যাচেলর মানুষ ছোটটা দিয়েই চলবে ।

অনার্স পরীক্ষা চলাকালীন হরতাল অবরোধের কারণে বেশ লম্বা একটা ছুটি পড়লো । মুন্না বললো, ভালো লাগছে না রে, একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি । ঢাকায় যাবার সময় আমি ওকে পরিবহনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম, কলেজের সামনে একটু এগোলেই বাসস্ট্যান্ড, বাসে ওঠার আগে ও বললো পাঁচদিন পরেই চলে আসবে । কি আশ্চর্য! পরীক্ষার দিনও মেয়েটা এলো না, পরেরদিনও না!

ওর ঠিক কী হয়েছে জানার কোন উপায়ও খুঁজে পেলাম না, নব্বই- এর দশকের কথা, তখন দোকান থেকে ফোন করতে হতো টিএনটি নম্বরে। চিঠিই ছিলো খোঁজ নেবার প্রধান উপায়। পরীক্ষা শেষ করে চিঠি লিখছিলাম, উত্তর আসেনি । ওর রেখে যাওয়া মগটাতে পানি খেতে গেলেই ওর কথা মনে পড়তো । মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে আমার বিয়ে ঠিক হলো, দাওয়াত দেবার জন্য ওদের খুলনার বাড়িওয়ালার বাসায় গিয়ে একদিন টেলিফোন নম্বর জোগাড় করে নিলাম, অনেক আবেগ নিয়ে ফোন করলাম কতদিন পর মুন্নার সাথে কথা হবে! ফোনটা রিসিভ করলেন মুন্নার মা, ওর কথা জিজ্ঞেস করতেই বিষন্নকন্ঠে বললেন, 'ও তো মারা গেছে!'

হিসেব করে দেখলাম, যেদিন আমি মুন্নাকে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম তার ঠিক সাতদিন পরে ও চলে গেছে দূর অজানায় । ঢাকায় পৌঁছে কোনরকম বিশ্রাম না নিয়ে আবার হাজব্যান্ডের কাছে চট্টগ্রামে রওনা হয়েছিল, প্রেগন্যান্সির প্রথম স্টেজে ছিল, সামান্য ইনফেকশন থেকে মেয়েটা মারা গিয়েছিল!

কতবার মুন্নার দেয়া তোয়ালেটা বের করে আবার রেখে দিয়েছি, কয়েক ডজন গ্লাস, মগ ব্যবহার করা হয়েছে এই পঁচিশ বছরে, কিন্তু আজও ঐ স্টিলের মগটা আমি ব্যবহার করি, ওটা দেখলে ওর কথা মনে পড়ে, ওর জন্য দোয়া করি ।

কোয়ারেনটাইনের এই অবরুদ্ধ সময়টাতে জমিয়ে রাখা এমন অসংখ্য জিনিস আবার ধুলো মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি, ব্যস্ততম জীবনে হয়তো বছরের পর বছরও সেগুলো নিয়ে ভাববার সময় হতো না । আমার হাজব্যান্ড অনেক সময় বাসায় কোন মেহমান এলে গল্পের ছলে হেসে বলেন, "আমাদের বাসায় এমন কিছু জিনিস আছে যা জীবনে একবারও ব্যবহার হয়নি। তোমাদের কি এরকম কিছু আছে?" মাঝেমাঝে ও আমাকে বলে, "কাজে না লাগলে সেগুলো রেখে লাভ কী, কাউকে দিয়ে দাও।"

আমিও দিয়ে দিতে চাই, দিয়েও থাকি অনেক নতুন নতুন জিনিস অনেককে, কিন্তু দিনশেষে ঐ স্মৃতিবহুল জিনিসগুলোকে আবার আঁকড়ে রাখি সযতনে । অনু হয়তো ভুলে গেছে অনেক কিছু, প্রথম আলোর নকশা দেখে আমার পছন্দ করা একটা শাড়ি কিনতে কত কষ্ট করে রোজা রেখে কুমিল্লা থেকে নারায়নগঞ্জ 'রঙ' এ নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, তখন ওদের ঐ একটাই শাখা ছিল । শাড়িটা পুরনো হয়েছে, হয়তো এখন অনেকে রেশমী কাতানের নামও জানে না, কিন্তু আমি এখনও শাড়িটি গোছাতে গেলে বিশ বছর আগের সেই দিনটিতে ফিরে যাই, স্পষ্ট দেখতে পাই সুন্দর সময়টাকে।

সময়ের আবর্তে দিন পেরিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু কিছু অনুভূতি পুরনো হয় না, কিছু স্মৃতি মলিনও হয় না কখনও। কেবল ব্যস্ত জীবনের আবরণে ঢেকে যায় ক্ষণস্থায়ী মেঘের মতো!

গদ্য

মানুষ হিসেবে স্মৃতিধারণ আমাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আর কোন প্রাণী একই সাথে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে পারে না ।

স্মৃতির একটা বিশাল পাহাড় জমে আছে মাথার ভেতরে । আমি হাঁটতে শুরু করি অন্য কোন স্মৃতির আঙিনায়, যেদিন মায়ের সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল, ৩৫৪ দিন পর এক সন্ধ্যায়, সাদা ধবধবে একটা পোশাকে পুরো শরীরটাকে জড়িয়ে মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন...!

লেখক-
জিনাতুননেছা জিনাত
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, সিনিয়র শিক্ষক।

নক্ষত্রকণা

তানভীর মাহমুদ

কবি মাত্রই স্মৃতি তৈরী করার কাজ করেন। শিল্পীর কাজই স্মৃতির ভাস্কর্য নির্মাণ। এই মৌলিক সত্য অনুধাবন করতে পারেন বলেই– শুনতে কিছুটা প্রাথমিক স্তরের প্রশ্ন মনে হলেও – কবিতা বা শিল্পকে টিকে থাকার তথা স্মৃতিতে একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতেই হয়। নতুন কবি আর পুরনো কবি যিনিই হোন না কেন, তার কবিতা কতদিন মানুষ পাঠ করবে, মনে রাখবে এমন ভাবনা, আশা ও আশংকা সব কবির মনে না থাকলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিদের অনেকের মনেই বিরাজ করে। বাংলা কবিতায় গত চারটি দশকে অন্তত স্মৃতিতে ভিন্ন মাত্রার অথবা নতুন বা চমৎকার কিছু দিয়ে স্মৃতিতে থাকা যায় কিনা ইত্যাদি নানা গবেষণা হয়েছে নানা নামে। সকলেই নতুন কিছু আনবেন অথবা পুরনোকে নতুন করে আনবেন কিনা, কেমন করে নতুন করে তুলবেন, কেমন করে মানুষের তথা পাঠকের মনে ঠাঁই পাবেন দশকের পর দশক বা শতাব্দী এমন চেষ্টা করে চলেছেন। সে–সব চেষ্টার প্রতি প্রণতি জানাই। মনে রাখা ভাল মাঝে মাঝে চেষ্টা করার নামও কবিতা। সমালোচক একে নিরীক্ষা বললেও আমরা একে সাধনা বলি, কাজেই কবিতা বলি।

কবিতা কিভাবে স্মরণযোগ্য হয়ে ওঠে বা ভালো কবিতা হয়ে ওঠে তার নানা দিক বহু গুণীজন দেখিয়েছেন, বহু ভিন্নমতও আছে এই কারু ঘিরে এবং আরও বহু মত থাকা সম্ভব। এসব মেনে নিয়ে অল্প কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। একজন কবির প্রথম ও প্রধান কাজ কবিতার ভাষা তথা কবিতার জগতকে গড়ে তোলা। সেই জগতের যেমন বহির্জগত রয়েছে, তেমন অন্তর্জগতও রয়েছে। ভেতরের জগতকে বসতি দেয়ার ও স্থিত হতে দেবার জন্যই বাইরের জগতের দৃশ্যযোগ্য কাঠামো দাঁড়ায়। আবার ভেতরের শক্তিতেই সেই কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাণ না থাকলে সুঠাম দেহ দাঁড়ায় কেমন করে? কাঠামোর সৌষ্ঠবই শিল্প নয়, খুঁত নিয়েও প্রাণের কারণে রনেসাঁ- র যুগের বহু শিল্প মাস্টারপিস হয়েছে আর নিখুঁত হয়েও শিল্প হয়ে ওঠেনি অনেকের কাজই।

কবিতার জগতকে দৃশ্য ও স্পর্শগ্রাহ্য করে তোলার যাত্রা কবিতাকে বিবিধ পথে নেয়। এই যাত্রাগুলোতে কবিতা কোন কোন পথে হাঁটে তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। স্মৃতিতে গেঁথে

থাকবার জন্য কবিতার মহাপরিসর যেমন গুরুত্বপুর্ণ তেমনি সেই মহাপরিসরকে ধারণ করার মত কাঠামোও তার থাকতে হয়। মহাকাব্য বলে ক্ল্যাসিকাল যেসব কাব্যের উদাহরণ আছে আমাদের চোখের সামনে তারা মহাপরিসর থাকবার বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরে আমাদের সামনে। ইলিয়াদ, মহাভারত এমন সব মহাপরিসরের কাব্য। কিন্তু এদের লেখকগণের শিল্প কাঠামোও যুতসই ছিল – নাটকীয়তা, চরিত্রচিত্রণের পারদর্শিতা ইত্যাদি ছিল সেখানে। কেবল নীতিকথা আর দার্শনিকতাই শিল্প নয়; সেজন্য আলাদা সব জ্ঞানকাণ্ডই রয়েছে। তবে আমাদের অনুধাবনে কাঠামো বলতে যে কঠিন একরৈখিক গড়নের কথা মনে আসে আমার উদ্দিষ্ট তেমন কিছু নয়। বরং বলতে চাইছি বিষয়, কথা, সুর, ছবি ও অনুষঙ্গের মাঝে হাওয়া বয়ে যাবার মত সময়কে কতটা বয়ে যেতে দিচ্ছি — চিত্রটিকে বা কথাটিকে স্থিত হবার মত পরিসর তৈরী করছি কিনা ইত্যাদি বিবেচনা। মানসে কিছু পরিসর তৈরি করার মাধ্যমেই স্মৃতি গড়ে ওঠে। সেই পরিসরে আসলে কবির তৈরী করা চিহ্নগুলো কোন ছবি, কথা অথবা অনুভব নিয়ে স্থায়ী হয় তা ভেবে দেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখা জরুরী, কবিতা কয়েক হাজার বছরের মানবিক সময় পেরিয়ে এসেছে এবং আমাদের হাতে বহু জাতির বহু উৎকৃষ্ট কাব্যের উদাহরণ বর্তমান। কাজেই কবিতার মানসে বদল যেমন জরুরী, এর প্রকাশের শিল্পেও সুচারুতা আসবে এমনই আশা করি। সেই ভাবনার পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি- ‘কথা বলাই কবিতা নয়।’ কথা বলা একটি মঞ্চের শিল্প হতে পারে। কবিতায় যদি কবির প্রাতিস্বিক প্রত্নমানস ধরা না পড়ে, তবে চমক দেয়া কবিতা ক্ষণিকে যত আবেদন জোগাবে তা হারিয়ে যাবেও ততই দ্রুত। কবিতায় চমক দেয়া এবং আজকের অধিকাংশ লোক কী পড়তে আগ্রহী সেই বিবেচনা থেকে কবিতার বাইরের জগতকে নিয়েই যদিও সকলে মাতামাতি করে, তথাপি ভেতরের জগতই মৌল। সেদিকে চোখ পড়ে না বলেই হুট করে কিছু কবি ও তাদের পাঠক আসেন, পলকেই তারা হারিয়েও যান। ভেতরের জগতে কিছু থাকলে চমক দেয়ার পরও কবিতা হারাবে না, কিন্তু ভেতর ফাঁপা হলে বহু চমক, বহু বিষয়, সাম্প্রতিকতার চাপ, বুদ্ধিবৃত্তিক দেনা শোধ, ধর্মীয় শব্দ ও ‘অনুষঙ্গের’ দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ইত্যাদিতে কবিতা ভেঙে পড়বে। যেমন দেখতে পাই ভেঙে পড়ছে অনেকেরই কবিতা – নীরবে ভাঙছে বলে লোকে ভাবছে এটা হয়ত রক মিউজিকের মত একটা ডিস্টর্টিভ আর্ট হচ্ছে। কিন্তু এটা যে ক্ষয়

(ডিজেনারেশান) তা ধরতে পারছে না কেউই। একটা কথা ভুলে যেন না যাই, মিছরির দানা আর কাচের টুকরো কিন্তু এক নয়। একটিকে আপনি খাবেন আর মিষ্টতা পাবেন, অন্যটি আপনার জিভ- গলা- পাকস্থলী জখম করে এগুবে।

আমাদের অগ্রজদের কবিতায় কী কী ঘটে গেছে সেসব নিয়ে বিস্তর বলা হয়েছে এরই মধ্যে। তারা যতখানি এগিয়েছেন আমাদের কাজ হবে তার চেয়ে কিছু বেশীদূর এগুনো, অথবা ভিন্ন কোনদিকে এগুনো। দেখে নিতে চাই আমাদের সময়ে কী ঘটছে। আমাদের সমসাময়িক কবিবন্ধুগণ নানা প্রবণতা ও প্রকাশ নিয়ে হাজির হয়েছেন – তার একটি হলো চিত্রপ্রধান কবিতা। আমাদের সময়ের কবিতায় চিত্রের একটি বিশেষ ক্রিয়াশীল চরিত্রও রয়েছে। আমাদের চিত্ররূপময় কবিতার যেসব ধারা নতুন করে তৈরী করতে চাইছেন এই সময়ের কবিরা তার মাঝে একটি ধারা দেখেছি কবিতার দেহে অজস্র চিত্রকে প্রবাহিত করে দিতে চাইছে। আমার চোখে এই প্রবণতার যে চরিত্রটি ধরা পড়েছে তা হলো চিত্রকে তারা প্রবাহিত করে অভিমুখহীনতায় বিলীন করে দিচ্ছেন। ঘটনা হচ্ছে, অজস্র ছবি প্রবাহিত করে দিলে স্মৃতিতে সেসব গাঁথার অবকাশ পায় না, তার বদলে স্মৃতি থেকে এরা ঝরে যায়, অর্থাৎ এদের এভাবে ঝরিয়ে ফেলে দেয়াই হয় আসলে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি আমাদের সময়ে চলচ্চিত্র যেমন করে দৃশ্য নিয়ে নিজের সংকট থেকে বের করে আনতে কী করেছে। ভাবতে হবে যে, ছবিটি স্থায়ী হলেই কেবল স্মৃতিতে গাঁথে, একটি স্মরণযোগ্য কবিতা জন্ম নেবারও সম্ভাবনা তৈরী হয়। পরিমিতিবোধ এক্ষেত্রে একটি চাবি বটে। মনে রাখতে বলি, ছবিটি তার নিজের আবহ ও পরিসর দাবী করে এবং ছবিটিকে ও তার পরিসরকে, অথবা যেকোন একটিকে অন্তত হতে হবে বাঙময়। আরেকটি দিকে খেয়াল রাখবেন, ছবিরও কিন্তু সুর আছে। গভীরতর দিকটি হলো, ছবিটির কিছু সময় প্রয়োজন তার সুরকে বয়ে যেতে দিতে। ছবি- সুর- পরিসরের তেমন অন্তর্বয়িত কবিতাই স্মৃতিতে নিজেকে বসিয়ে নেয়।

আমাদের কবিতার একটি বড় সংকট হলো আমরা কবিতাকে বরাবর কবিতার বাইরের কোন কিছুর প্রতিনিধি করে তুলতে চেয়েছি। অন্য কিছুর ওপর ভর করে কবিতাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছি আমরা অনেকেই। আবার যখন সেই চাপ থেকে মুক্তি চেয়েছি তখন ভর করেছি ছন্দের বাহনে।

আমরা বরাবর ভুলে গিয়েছি যে কবিতা, অন্য শিল্প মাধ্যমের মতোই, এমন কিছু বাস্তবকে ধরতে চায় যা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। সংগীতের উচ্চাঙ্গের সাথে, চিত্রকলার শীর্ষের সাথে কবিতার মিল রয়েছে। কবিতা বিমূর্ততাকে ধরতে চায়। কবি প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক, লঘু যা- ই হয়ে উঠতে চান না কেন, বিমূর্ততা অ- মূর্ত হয়ে ওঠাকে তার ধরতে শিখতে হয়। তাকে বিমূর্ত কবিতা লিখতে হবে এমন নয়, তাকে এবস্ট্রাকশান এর প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে। এটি একটি সক্রিয়তা যা তার অন্তর্মানসে ঘটবে। আমাদের কবিতায় এবং সঙ্গীতে এই যাত্রার বহু স্বাক্ষর রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও রয়েছে এর প্রমাণ। আলবের্তো জাকোমিত্তি বা কামরুল হাসান বিমূর্ত শিল্প গড়েননি কিন্তু শিল্পের এবস্ট্রাকশানকে ধরতে জানতেন। সেখান থেকে শিল্পকে চরিত্র দিতে জানতেন। জয়নুলের রেখা কথা বলে দেখেই আপনি তার মুখহীন সাঁওতালদের ছবিকে ভুলতে পারেন না। তাদের সামুহিকতার চরিত্রকে আপনি মন থেকে মুছতে পারেন না।

সঙ্গীতের কথা বলি এবার – সুরের কথা বলি। সুরের নানা সূক্ষ্ম কাজ তার উচ্চাবচতায় কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। এটা বলা আমার উদ্যেশ্য নয় কবিতাকে সুরেলা বা তান প্রধান হতে হবে, বরং আমি বলতে চাইছি সেসব কবিতাই স্মরণীয় হয় যারা হয় সাংগীতিক। সঙ্গীত তো বহু মাত্রাকে ধারণ করে, কাজেই সুরের খেলাকে সঙ্গীতের বড় পটে মেলে দিয়ে ছবি আঁকার ফল বেশ যাদুকরী হয়। সুরের ওঠানামার কথা বলতেই হবে। সুরে বৈচিত্র্য থাকে বলেই সুর আমরা মনে রাখি। বৈচিত্র্য আমাদের স্মৃতিতে নানা খাঁজ কেটে গেঁথে যায়। মনে পড়তে পারে নাট্যিক সংগঠনের কথা – উন্মোচন, পটপরিবর্তন, ক্লাইম্যাক্স, দেইনুমাং বা আবেগের মুক্তি বা আবেগকে স্তিমিত হতে দেয়া। বাঁক নেয়ার খেলা যদি না থাকে তবে সুর পড়ে যেতে বাধ্য। প্রচুর ছবি যদি ফ্ল্যাট সুরের মতো বয়ে যায়, তবে তা মনে রাখাও দুঃসাধ্য। কবিতাকে নাটকেরই মতো কিছু পর্যায়ের ভেতর দিয়ে আনা একটি সহজ চেষ্টা হতে পারে। অনুভূতিকে গড়ে তুলতে তাকে কিছু দৈর্ঘ্যের ও পরিসরের ভেতর দিয়ে আনার কাজটি কবিতাকে ফলিয়ে তুলতে পারে। অনুভুতি এভাবে গড়ে ওঠে, স্মৃতিও।

সুরের বাহন হতে হবে একটি স্বরকে। স্বর মানে গলা নয়, কণ্ঠ নয়। স্বর অস্তিত্বের গ্রাহ্যরূপ। স্বর প্রক্ষেপিত জীবনের নাম। স্বর কবিরই নাম। স্বরে খসখসে বা মোলায়েম টেক্সচার চরিত্রের স্মারক।

আমাদের সময়ে কবিদের মাঝে অন্যতম আলোচ্য বিষয় কবিতার ভাষা – বস্তুত ভাষাই কবিতা, কেননা ভাষাই জগৎ ও মানস। আপনি ভাষাকে গড়ছেন না, আসলে আপনার জগতকে গড়ছেন, কিংবা জগতকে গড়ছেন না আসলে ভাষাকেই গড়ে তুলছেন। ভাষায় প্রকাশ ও অপ্রকাশের কিংবা আলোআঁধারির জগতও আছে। কথাটাকে এভাবে বলা যায়- ভাষা প্রকাশ করে আবার গোপনও করে। সঙ্গীতে যেমন সব সুর বাইরের দিকেই বাড়ে বা এগোয় তা নয়, কিছু তো অন্তরীনও (ইন্টার্নালাইজ) করা হয় নতুবা কথাহীনতার জগতকে বোঝা যায় না। বাস্তব তথা কবি তার আত্মায় যে বাস্তবকে যাপন করেন, তার ধরণই নির্ধারন করে কেমন হবে তার ভাষা। কেউ নীরবতাকে কবিতায় অভিব্যক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই সামনে আনেন, কেউ আবার নীরবতায় মন্থন করে গাছের ছায়ার পাশে রেখে তার একেকটি অলিন্দকে এঁকে দেন নীরবতায়।

ভাষা অনুভুতি গড়ে তোলে, অভিজ্ঞতা তৈরী করে, কেননা কবির স্বতন্ত্র জগত নিজেকে উপস্থাপন করে কবিতাতে, কেননা কবি তার ভাষাই লেখেন কবিতায়। বিভিন্ন বাস্তবের বিভিন্ন রূপ নিয়ে কাজ করার বেলায় কবি নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে যে বোঝাপড়া তৈরী করেন তার রূপ দেখা যায় কবিতায়। কবিতায় গাঁথা মোজাইকের মত চিত্রসুরের বা অদ্ভুতের এবং গহীনকে ধরে থাকা তার আত্মার অতলতা আমাদের দাঁড়া করায় নতুনতর অভিজ্ঞতায়, সেই পরিসরে দাঁড়া করে নতুন রূপের মুখোমুখি, ঘটায় রূপান্তর, দেয় নতুন জন্মও। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সিকদার আমিনুল হকের মত কিছু শিল্পীর কথা।

কবিতায় পরিশীলিত মানস বা আত্মার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ভাবে। এখানেই তফাৎ ঘটে যায় বড় ও ঊন কবির মাঝে — দুজনে একই ধারার বাস্তব নিয়ে লিখলেও ফারাকটা কোনভাবেই এড়ানো যায় না। উদাহরণ দেয়া যায় মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে তারই মত কাছাকাছি ধারার বাস্তব নিয়ে কাজ করা অন্যদের মাঝে যে পার্থক্য ঘটে গেছে তা নিয়ে। মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতায় প্রতিনিয়ত দেখা আপাতদৃশ্য বাস্তবের পাশে ভেসে থাকা গহীন বাস্তবের খেলা অনন্য সুর তৈরী করে— এসব কেবল পরিশীলিত মানসের ও ভাষার ফল। সুতার মত একটি সুর জড়িয়ে থাকে পরতে পরতে।

এবং কিছু হঠাৎ আলোর ঝলকানি কবিতাকে আকর মূল্য দেয়। এই সময়ের কবিরা তেমন উদাহরণের সামনে পড়েছেন বলেই বিশ্বাস করি। একেকটি ঝলকই হয়ে ওঠে একেকটি কবিতা- পরিমিতিবোধের কথা ফিরে এল কি? হঠাৎ আলোর ঝলকানির আরেক মূল্য তার ফাইন্যালিটিতে, এর নাম কি প্রস্তাব করতে পারি চূড়ামন্যতা? স্বতস্ফুর্ততার মত এসব প্রকাশ প্রায়ই এমন বাস্তবকে ধরে রাখে যা কবির গহীন আত্মার দীর্ঘ ধ্যানের ও পরিশীলনের থেকে জন্ম নেয়া নক্ষত্রকণা। বাংলা কবিতায় এমন আপাত- স্বতঃস্ফুর্ত ও গভীর মুক্তি তার বহুতলস্পর্শীতা নিয়ে যুগে যুগে জেগেছে।

লেখক-
তানভীর মাহমুদ।
ইংরেজিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। এমবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অপরাধতত্ত্ব ও বিচার- এ এমএসএস।
প্রকাশিত বইঃ **প্রতিবিহার (কবিতা)**

রাজনীতি

তুরস্ক : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামরিক উচ্চাভিলাষ

সাইদুর রহমান

নেটোভুক্ত একমাত্র মুসলিম দেশ তুরস্ক। ভৌগলিক অবস্থান, সামরিক শক্তি ও মুসলিম বিশ্বের কণ্ঠ হিসেবে যার নাম গণমাধ্যমে উঠে এসেছে বারবার। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (GFP) সূত্রমতে তুরস্ক পৃথিবীর এগারতম সামরিক শক্তির দেশ এবং নেটোতে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই যার অবস্থান।

তুরস্কের ইতিহাস অনেক পুরনো। আরতুগ্রুল গাজির হাত ধরে উঠে আসা এক যোদ্ধা জাতির নাম তুরস্ক। ওসমানিয় ৬শ' বছরের শাসন মুসলিম ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ১২৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত টিকেছিল গৌরবময় ইসলামি উসমানীয় সালতানাত। ইসলামের প্রায় সব পবিত্রস্থান ছিল এই সালতানাতের অধীনে এমনকি মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মুকাদ্দাস। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিলে তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং মিত্র শক্তি তুরস্কের সব উপনিবেশ ভাগাভাগি করে নিয়ে তুরস্কের অস্তিত্ব সঙ্কটে ফেলে দেয়। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী তুরস্ককে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কামাল পাশার নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে হয়। ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্ক এক ঘোষণার মাধ্যমে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কামাল পাশা ক্ষমতায় আসার পর থেকে তুরস্ককে একটি আধুনিক ইউরোপীয় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি সেকুলারিজমকে রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সংবিধানে স্থান দেন এবং সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় সেনাবাহিনীকে। ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার সে প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

২০০৩ সালে এরদোগানের নেতৃত্বে ইসলামি ভাবধারায় উজ্জীবিত 'জাস্টিস এন্ড ডেভলেপমেন্ট পার্টি' ক্ষমতায় আসে এবং কোরানে হাফেজ এরদোগান প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই তুরস্কের প্রভাব, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে মনযোগী হয়ে ওঠেন। তার সঠিক ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে তুরস্কের বৈশ্বিক অবস্থান শক্ত হচ্ছে। ওসমানিয় খলিফাদের মত তিনি নির্যাতিত সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর নীতি গ্রহণ করেছেন। নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করেন এবং সর্বময় ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত হয়। পশ্চিমাদের রক্তচক্ষু

উপেক্ষা করে কখনো আফ্রিন, কখনো ইদলিবে অভিযান পরিচালনা করেন। কখনো খোদ যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়ে বসেন। রাশিয়ার যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করার মত দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন কখনো। পশ্চিমা অনেক বিশ্লেষকের মতে, এরদোগান ওসমানিয় সুলতানদের মত ক্ষমতা ও সামরিক প্রভাব বিস্তারে মনোযোগী হয়েছেন।

তুরস্কের সিরিয়া অভিযান : পশ্চিমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ

ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের ভূমি নিয়ে একটি কুর্দি রাষ্ট্রের স্বপ্ন কুর্দি নেতা ও ইসরাইলের বহু পুরানো। ইসরাইল চায় একটি কুর্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মধ্যপ্রাচ্যে একজন নতুন মিত্র মিলবে। যাদের ভাবধারা ও ধর্মবিশ্বাস হবে ইসরাইলের মত। পশ্চিমারাও চেয়েছিল এমন একটি রাষ্ট্র যা হবে ইসরাইলের মত মধ্যপ্রাচ্যে আরেক ক্রীড়নক। তুরস্কের চাপে পশ্চিমারা কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টিকে (পি.কে.কে) সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু তার একটি সশস্ত্র শাখা ওয়াই.পি.জের প্রতি পশ্চিমা ও ইসরাইলের ছিল সামরিক ও কূটনীতিক সমর্থন। ওয়াই.পি.জে ব্যবহৃত প্রায় সব অস্ত্র মার্কিন বা ইসরাইলের তৈরি। আফ্রিন, আলেপ্পো ছিল কুর্দি সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু ২০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মার্কিন ও পশ্চিমাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তুরস্ক আফ্রিনে 'অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ' শুরু করে। মাত্র দু'মাস চারদিনের যুদ্ধে ওয়াই.পি.জে আফ্রিনে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর এরদোগান আলেপ্পো অভিযানের ঘোষণা দেন। তখনো সেখানে কুর্দিদের সমর্থনে মার্কিন সৈন্য উপস্থিতি বজায় রেখেছিল। এরদোগান আলেপ্পো থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান নতুবা মার্কিন সৈন্যদের লক্ষবস্তুতে পরিণত করার ঘোষণা দেন। এরদোগানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ০৬ অক্টোবর ২০১৯ ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিলে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তুর্কি সৈন্যরা 'অপারেশন পিস স্প্রিং' শুরু করে। মাত্র আটদিনের যুদ্ধে তুরস্ক ৪৮২০ বর্গকিলোমিটার জায়গা দখল করে যার মধ্যে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ 'রাস আল আইন', তেলয়াবিয়া, মানবিজ রয়েছে। এতদিন যে অঞ্চলে মার্কিন সৈন্যদের পাহাড়ায় কুর্দিরা দখল বজায় রেখেছিল এবং একটি নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিল। তুরস্কের অভিযানের মুখে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারে তারা হতাশ ও স্বপ্নভঙ্গ হয়। এ অভিযান বন্ধে পশ্চিমাদের তোরজোড় কম ছিল না, কিন্তু এরদোগানের সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে মধ্যপ্রাচ্যে আরেক ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পশ্চিমা স্বপ্ন মাটিতে মিশে গেল।

লিবিয়া : তুরস্কের সামরিক শক্তির আরেক পরীক্ষাগার

২০১১ সালে নেটো হামলায় গাদ্দাফির পতনের পর থেকে তেলসমৃদ্ধ দেশটিতে বিবাধমান পক্ষগুলো সহিংসতায় জড়িয়ে পরেছে। দেশের শাসনভার মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে জাতিসংঘ স্বীকৃত জি.এন.এ সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে ত্রিপলি অন্যদিকে খলিফা হাফতারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বেনগাজি সহ পুরো পশ্চিমাঞ্চল। দুপক্ষের রয়েছে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সমর্থন। তুরস্ক, ইটালি, কাতার সমর্থন দিচ্ছে জি এন এ সরকারকে। খলিফা হাফতারকে সমর্থন দিচ্ছে রাশিয়া, সৌদি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর এবং গোপনে সমর্থন দিচ্ছে ফ্রান্স। অতিসম্প্রতি গ্রিস, ইসরায়েল ও মিশর ভূমধ্যসাগরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান ও ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে পাইপলাইন স্থাপন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যে পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে তেল-গ্যাস সরবরাহ করার কথা রয়েছে। এ অঞ্চলে তুরস্কের স্বার্থ রক্ষায় লিবিয়ার সাথে একটি চুক্তি প্রয়োজন হয় তুরস্কের, যাতে করে এই প্রকল্প বাধাগ্রস্ত করা যায় অথবা তুরস্কের অনুমতি প্রয়োজন হয়। সে লক্ষে ২০১৯ সালে তুরস্ক লিবিয়ার সাথে একটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তি সাক্ষর করে এবং জানুয়ারি ২০২০ সালে লিবিয়ায় প্রযুক্তি সহযোগিতার নামে সেখানে সৈন্য মোতায়েন করে। এরপরেই জি এন এ বাহিনী ত্রিপলির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় এবং সির্তে দখলের জন্য এগিয়ে যায়। মিসর আগে থেকেই সির্তে শহরকে রেডলাইন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। মিশর সংসদে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে, যাতে মিশরের সৈন্যরা দেশের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারে। এর মধ্যে তুরস্কের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ করে বিমান হামলা চালানো হয়েছে, তুর্কি যার জন্য মিসরকে দায়ী করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে যুদ্ধ হলে কে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার এর সূত্রমতে, মিশরের অবস্থান অষ্টম অপরদিকে তুরস্কের অবস্থান এগারতম। তবে তুর্কি বাহিনী মিশরের বাহিনী থেকে বেশি কার্যকর বলে মনে হয়। মিসর সিনাইয়ের বিদ্রোহ সাত বছরেও দমন করতে পারেনি। অপরদিকে তুরস্ক পিকেকে, ওয়াই পি জে এবং রুশ ও ইরান সমর্থিত আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তুরস্কের ড্রোন হামলা ঠেকাতে সিরিয়া রাশিয়ান আধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'পানসির- ২' মোতায়েন করেছিল কিন্তু তুরস্কের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি 'টি বি- ২' ড্রোন তা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তাই মিশরের সাথে যেকোন যুদ্ধে জয় তুরস্কের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক তুরস্কের ভবিষ্যৎ ও শঙ্কা

ভূমধ্যসাগর, এজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর বেষ্টিত তুরস্কের যেমন রয়েছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তেমনি রয়েছে শঙ্কা। পূর্ব- ভূমধ্যসাগর তেল- গ্যাসসমৃদ্ধ হওয়ায় এর মালিকানা নিয়ে তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব। অতিসম্প্রতি তুরস্কের জাহাজ গ্রিসের কাছে একটি দ্বীপে তেল- গ্যাস সন্ধান করতে গেলে গ্রিসের নৌবাহিনী বাধা দেয়। আয়া সোফিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিসের মন্তব্য ভালোভাবে নেয়নি তুরস্ক। সম্প্রতি গ্রিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভূমধ্যসাগরে রণতরী মোতায়েন করে ফ্রান্স। গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভূমধ্যসাগরে তুরস্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে গ্রিস, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তাদের থামানো হবে'। এজিয়ান সাগরের তেল- গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা নিজেদের বলে দাবী করেছে গ্রিস, যাতে সমর্থন দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু তুরস্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হুলুসি আকার হুশিয়ার করে বলেছে, 'তুরস্কের স্থলবেষ্টিত যে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তুরস্ক তা ছিঁড়ে ফেলেছে'। ভূমধ্যসাগরে শুধু তুরস্ক, গ্রিস, ইটালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন নয়, জোড়ালো উপস্থিতি বজায় রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। রাশিয়াকে মোকাবেলা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশটি ফ্রিগেট মোতায়েন রয়েছে ভূমধ্যসাগরে। অন্য দিকে রাশিয়া সিরিয়া যুদ্ধের সময় থেকে ভূমধ্যসাগরে তাদের উপস্থিতি জোরদার করেছে। তারা সেখানে নৌশক্তি বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে গঠন করে 'মেডিটেরিয়ান নেভাল ফোর্স', যার আওতায় দুটি ক্রুজ মিসাইল সজ্জিত সাবমেরিন মোতায়েন করেছে। তুরস্ক চায় উসমানীয় আমলে ভূমধ্যসাগর, এজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরে তাদের যে প্রভাব ছিল তা ফিরিয়ে আনতে। বিশ্বশক্তিকে চ্যালেঞ্জ, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, সমুদ্রে তেল- গ্যাস অনুসন্ধান করার জন্য তুরস্কের বিমান ও নৌশক্তি বৃদ্ধির বিকল্প নেই তা বুঝতে দেরি করেননি এরদোগান। ক্ষমতায় এসেই তিনি বিমান ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করতে মনযোগী হন। নৌশক্তি বৃদ্ধির অংশ হিসেবে মিলগেইম এর আওতায় ছয়টি করে করভেট, ফ্রিগেট ও সাবমেরিন নির্মাণ শুরু করে। করভেটের কাজ হবে সাবমেরিন শনাক্ত করে ধ্বংস করা। ফ্রিগেটের মাধ্যমে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। ২০২২ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে প্রতি বছর একটি করে সাবমেরিন তুরস্কের নৌবাহিনী সার্ভিসে আনবে। যেগুলো T-214 Air Independent Propulsion ধাচের, যার প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করছে জার্মানির থাইসেন ক্রুপ মেরিন সিস্টেম।

সাবমেরিনগুলোতে থাকবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টর্পেডো ও গাইডেড মিসাইল যা দিয়ে সফলভাবে সাগর ও স্থলে হামলা চালানো যাবে।

অন্যদিকে তুরস্কের বিমানবাহী রণতরী টি সি জি- আনাদুলু এ বছরেই সার্ভিসে আসছে। এর দৈর্ঘ্য ২৩১ মিটার এবং প্রস্থ ৩২ মিটার। রণতরীটি কোন বেইজ সাপোর্ট ছাড়াই পুরো একটি ব্যাটিলিয়ন পরিচালনা করতে পারবে। রণতরিটি ২৭ হাজার টন বহন করতে সক্ষম, এর মাধ্যমে বিমান, হেলিকপ্টার ও মনুষ্যবিহীন ড্রোন (UAV) উড্ডয়ন ও অবতরণ করতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে তুরস্ক অভিজাত নৌশক্তিতে পরিণত হবে।

অপরদিকে বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তুরস্ক বিশাল এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তুরস্ক রাশিয়ার তৈরি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস- ৪০০ ক্রয় করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের এফ- ৩৫প্রগ্রাম থেকে তুরস্ককে বাদ দিয়ে দেয়। যার আওতায় একশটি এফ- ৩৫ যুদ্ধবিমান পাওয়ার কথা ছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়েই তুরস্ক ৫০বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরির ঘোষণা দেয়, এর নাম দেয়া হয় টি এফ- এক্স। ২০১৭ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে তুরস্ক সফরকালে ব্রিটিশ বি ই সিস্টেমের সাথে তুরস্কের টি আই এ সাথে ১২৫ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সাক্ষর হয়, যার আওতায় তুরস্ককে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরিতে সহযোগিতা করবে বি ই সিস্টেম। যার নকশার দায়িত্ব দেয়া হয় বিখ্যাত রোলস রয়েস সংস্থাকে। টি এফ- এক্স ভবিষ্যতে এফ- ১৬ এর স্থান দখল করবে। যার সংখ্যা ২৪৫টি।

আকাশযুদ্ধের কথা বলতে গেলে তুর্কি ড্রোনের কথা বাদ দেয়া যায় না। মনুষ্যবিহীন ড্রোন উন্নয়নে তুরস্কের অবাক করা সাফল্য বিশ্বশক্তিগুলোকে ভাবিয়ে তুলেছে। পৃথিবীর অন্যতম ড্রোন সুপার পাওয়ার তুরস্ক। বিশ্বের কোন দেশের এত ব্যপক পরিসরে ড্রোন যুদ্ধের ইতিহাস নেই যা তুরস্ক সিরিয়ার ইদলিবে পরিচালনা করেছে। ইদলিবে রাশিয়া ও ইরান সমর্থীত আসাদ বাহিনী পর্যুদস্ত হয় তুরস্কের ড্রোন হামলায়। তুরস্কের ড্রোনের নিখুঁত লক্ষ মার্কিন ও ইসরাইলের ড্রোনকে হার মানিয়েছে। তুর্কি ড্রোনের আরেকটি দিক হলো, ড্রোনে ব্যবহৃত সকল অস্ত্র তুরস্কের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এবং নিজস্ব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এগুলো পরিচালনা করা হয়।

রাজনীতি

তুরস্কের ছয় ধরনের ড্রোন থাকলেও ইদলিবে সফলভাবে ব্যবহৃত দুটি ড্রোন হলো, এরদোগানের জামাতা নির্মিত বায়রাক্তার টি বি- ২ ড্রোন ও আনকা। আরো আশার কথা হলো সম্প্রতি তুরস্ক আরো আধুনিক দুটি ড্রোনের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়া প্রচার করেছে যে এ দুটি ড্রোন সার্ভিসে এলে তুরস্ক হবে আধুনিক ড্রোন সুপার পাওয়ার।

আধুনিক যুদ্ধের আরেকটি অন্যতম হাতিয়ার মিসাইল সিস্টেম। তুরস্ক নিজস্ব প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন করেছে গগদোয়ান ও গজদোয়ান নামক স্বল্প ও দূরপাল্লার এয়ার টু এয়ার মিসাইল(AAM)। আরো উদ্ভাবন করেছে প্রথম মেরিটাইম মিসাইল হিসার- এ এবং আত্মাকা । তাদের রয়েছে শক্তিশালী সোম নামক জি পি এস নিয়ন্ত্রিত গাইডেড ক্রুজ মিসাইল।

তুরস্ক তার জলসীমা রক্ষা, প্রকৃতিক সম্পদ আহরণ, সর্বোপরি তার অস্তিত্ব ও প্রভাব টিকিয়ে রাখতে এবং বিশ্বশক্তির সাথে পাল্লা দিতে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। এরদোগানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তুরস্কের অবস্থান সুসংহত করতে তিনি কখনো পশ্চিমাদের বিরাগভাজন হয়েছেন, কখনো রাশিয়ার। তুরস্কের ভবিষ্যৎ সংঘাত হতে পারে ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগরকে কেন্দ্র করে গ্রিস, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, ইসরাইল ও মিশরের সাথে। যেকোনো যুদ্ধে পশ্চিমা মিত্রদের সমর্থন পাবে না এটা বুঝেই রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে তুরস্ক এবং সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর রাশিয়ার প্রয়োজন তুরস্ককে, কারন রাশিয়াকে ভূমধ্যসাগরে বসফরাস প্রণালি অতিক্রম করে যেতে হয়। যা যে কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তুরস্ক বন্ধ করে দিতে পারে।

এখন দেখার বিষয়, তুরস্ক কি পারবে তাদের সামরিক উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে নাকি মাঝপথে রুদ্ধ হবে উচ্চাভিলাষী স্রোত! এজন্য হয়তো অপেক্ষা করতে হবে দশকের পর দশক।

লেখক
সাইদুর রহমান
স্নাতক- ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ঢাকা কলেজ
স্নাতকোত্তর- রত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ।

রাজনীতি

প্যান- ইসলামিজম আন্দোলন: আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকট ও সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আব্দুল মুকিম

প্যান- ইসলামিজম বা সর্ব- ইসলামবাদ কী? প্যান- ইসলামিজম মূলত মুসলমানদের মধ্যে জাতিকেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, যেখানে সাংস্কৃতিক বা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের চেয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। উনিশ শতকের ইসলামি ভাবধারার রাজনৈতিককর্মী জামাল উদ্দিন আফগানিকে এর অন্যতম প্রবক্তা ও পুরোধা মনে করা হয়। উনিশ শতকের শেষদিকে যখন মুসলমানদের সর্বশেষ 'খিলাফত' উসমানী সাম্রাজ্য পতনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তখন মূলত খিলাফত টিকিয়ে রাখতে ও মুসলিম বিশ্বে ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিরোধের প্রয়োজনে জামাল উদ্দিন আফগানি প্যান- ইসলামিজমের ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। কাজেই, শুরুতে প্যান- ইসলামিবাদ বলতে মোটামুটি ধারণা ছিল, একটি একক ইসলামি রাষ্ট্র তথা খিলাফত (সাম্রাজ্য) ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তবে এ মতবাদ এখনও কট্টর শরিয়াহপন্থীরা ধারণ করে। কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আধুনিক ইসলামবাদীদের দ্বারা এর ধারণা কিছুটা বিবর্তিত হয়েছে; বর্তমানে মনে করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের দ্বারা মুসলমানদের জাতিকেন্দ্রিক ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা সম্ভব। তবে কিছু কিছু ইসলামি রাজনৈতিক আন্দোলনকর্মী ইমাম গাজ্জালি ও ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী 'উম্মাহ' শব্দটিকে রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করেছেন দাবি করে মনে করেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগ তথা রাশিদুন খিলাফত থেকে প্যান- ইসলামিজমের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

আধুনিকযুগে নেতৃস্থানীয় ইসলামি নেতা যেমন সাইয়েদ কুতুব, আবুল আলা মওদুদি ও আয়াতুল্লাহ খোমেনি প্রমুখ প্যান- ইসলামিজমের সমর্থক ছিলেন; কিন্তু তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের চাক্ষুষ ও নিরেট বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেননি। তারা প্রত্যেকেই ট্রাডিশনাল শরিয়া আইনে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে মুসলিমদের ঐক্যের ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন, যদিও এটা বাস্তবতাকে অস্বীকারের নামান্তর। তবে দু'দশক আগে আধুনিক ইসলামবাদী নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে প্যান- ইসলামিজমের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নেচমেত্তিন এরবাকান।

একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্যান-ইসলামিজম নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে তুরস্কের রাজনৈতিককর্মীদের বেশি উৎসাহী হতে দেখা গেছে। নেচমেত্তিন এরবাকানের সরকার তুরস্ক, মিশর, ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও বাংলাদেশ নিয়ে ডি-৮ নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলে। এটির লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো একক মুদ্রা (ইসলাম দিনারি), যৌথ বৈমানিক ও প্রতিরক্ষা কার্যকলাপ, পেট্রোকেমিকেল প্রযুক্তি উন্নয়ন, আঞ্চলিক বেসামরিক বিমান নেটওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ঐক্য সৃষ্টি করা। তবে ১৯৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কথিত অভ্যুত্থানের পর এরবাকান সরকারের পতন ঘটলে সংগঠনটির কার্যকলাপের গতি প্রায় স্থবির হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে প্যান-ইসলামিজমের কোনো প্রভাব বা সম্ভাবনা আছে কি? হ্যাঁ, আছে। নেচমেত্তিন এরবাকানের আকস্মিক পতনের পর এ আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়লেও ২০০০ সালে রিসেপ তায়িফ এরদোয়ানের নেতৃত্বে 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির' (একেপি) উত্থানের পর তুরস্কের রাজনীতিতে নতুনভাবে প্যান-ইসলামিজমের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। একেপির উত্থানের পর তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতিতেও বেশকিছু বদল ঘটতে থাকে। এদিকে তুর্কিদের দমিয়ে রাখা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পাদিত লুজান চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে আগামী ২০২৩ সালে। উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালে সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে সম্পাদিত ১০০ বছর মেয়াদী এ চুক্তির মাধ্যমে ওসমানী সাম্রাজ্যের বিভাজন হয় ও নতুন অনেক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এছাড়া এর মাধ্যমে বসফোরাস প্রণালীর আন্তর্জাতিকরণ করা হয় ও তুরস্কের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বলা বাহুল্য, এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তুরস্ক বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন। তবে এর মাধ্যমে 'নব্য অটোম্যান' পররাষ্ট্রনীতির ধারক তুরস্ক যে প্যান-ইসলামিজমের পথেই হাঁটবেন, তা সহজে অনুমেয়। এর তৎপরতা ইতোমধ্যে চোখে পড়েছে। ২০০৮ সালে তুর্কি-আফ্রিকা সহযোগিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আফ্রিকার ৫০টি দেশ অংশ নেয়। সৌদি আরব মনে করছে, 'নব্য অটোমান' পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে হর্ন অব আফ্রিকা দখল করতে চাইছে তুরস্ক। অসীম সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে জাতীয়তাবাদী যাঁতাকলে পড়ে আঁটকে যাওয়া

ওআইসির বিকল্প বৈঠক করে নিজেকে মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে দেখাতে চাইছেন এরদোয়ান। সম্প্রতি এরদোয়ান ২০০৮ সালের সাদৃশ্য আরেকটা সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ নিলে পাকিস্তান ও মালেশিয়ার মতো দেশগুলো ইতিবাচক সাড়া দেয়। এছাড়া সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ওসমানী সাম্রাজ্যের উপর নির্মিত তুরস্কের জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল 'দিরিলিস আর্তুগুল' পাকিস্তানে সরকারি অর্থায়নে প্রচারের উদ্যোগ নেন। এ ঘটনাও প্যান- ইসলামিজম আন্দোলনের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মত দিয়েছেন।

সম্ভাবনা ছাপিয়ে প্যান- ইজলামিজমের বেশকিছু সংকট লক্ষ্য করা যায়। এ আন্দোলনের প্রধান ও প্রথম অন্তরায় হলো ভৌগলিক জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আরব- অনারব দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে প্যান- ইসলামিজম আড়ালে চলে যায়। আরব বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ প্যান- আরব দল যেমন বাথ পার্টি ও নাসেরিস্ট পার্টি প্রায় সব আরব দেশে বিস্তার লাভ করে এবং মিশর, লিবিয়া, ইরাক ও সিরিয়ায় ক্ষমতায় আসে। প্যান- ইসলামপন্থীরা এসময় নির্যাতনের স্বীকার হয়। এ আন্দোলনের তৎকালীন চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব বন্দি ও নির্যাতিত হন। পরবর্তীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মিশরীয় রাষ্ট্রপতি নাসের আন্দোলনকে আরব জাতীয়তাবাদের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য শুধু আরবরাই নয়, প্যান- ইসলামিজমকে কেন্দ্র করে তুরুপের তাস মনে করা তুর্কিরাও জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। দেশের বাইরে সর্ব- ইসলামবাদ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন একেপি দলের নেতা এরদোয়ানকে সক্রিয় দেখা গেলেও নিজ দেশে কুর্দিদের তিনি শক্ত হাতে দমন করছেন। প্যান- ইসলামজিমের দ্বিতীয় ও অন্যতম আরেকটি সংকট হলো শিয়া- সুন্নিকেন্দ্রিক বৈশ্বিক বিরোধ। ইসলামের দ্বিতীয় খিলাফত কালে উদ্ভাবিত ও সেসময় হতে চলমান এ বিরোধ থেকে মুসলমানদের মুক্তি মিলছে না। প্যান- ইসলাম আন্দোলনের প্রবক্তা জামাল উদ্দিন আফগানি সমস্যাটির গূঢ়ার্থ বুঝতে পেরে এ সংকট হতে উত্তোরণের জন্য নিজেই চেষ্টা করেছিলেন। তার জীবনীগ্রন্থ অনুসারে তিনি শিয়া মতাদর্শী হলেও নিজেকে সুন্নি বলে দাবি করতেন। প্যান- ইসলামিজমের তৃতীয় সংকট হলো কট্টর শরিয়াহপন্থীদের তাকফিরি ফতোয়া। তাকফিরি ফতোয়া বলতে মূলত নিজেদের একমাত্র সত্য মনে করা ও অন্যদের মুসলমান মনে না করাকে বুঝায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর *হিজবুত তাহরির* মধ্য এশিয়ায় একটি প্যান- ইসলামি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এদের মধ্যে এ সমস্যা প্রকট এবং পরবর্তীতে এ সংগঠন জঙ্গীবাদী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনাটি ছিল মূলত তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর। তবে এখন কিছু 'তবে'- 'যদি'- 'কিন্তু'মূলক কথা দিয়ে সংকট ও সম্ভাবনাকে তুলে আনার মাধ্যমে আলোচনার উপসংহার টানার চেষ্টা করবো। প্যান- ইসলামিজমকে বর্তমান সময় বিবেচনায় অপরিহার্য মনে করা হলেও মূলত এটি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সামনে মুসলমানদের মাথা নত করার সমার্থক। কেননা, মুসলমানদের ঐশীগ্রন্থ কোরান কখনও কাঁটাতারে ঘেরা রাষ্ট্রকে সমর্থন করে না। আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে মূলত পাশ্চাত্যে এনলাইটমেন্ট উদ্ভবের পর থেকে। তবে তাই বলে নিশ্চয় মুসলিমরা তাদের রাজনীতি বন্ধ করে দেবে না। প্যান- ইসলামিজমের ধারণার আলোকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে কি বিশ্ব পরিচালনা আদৌ সম্ভব? হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উদারনীতিবাদীদের (Liberals) তত্ত্ব অনুসারে তা সম্ভব। তারা মনে করে, আগামীর পৃথিবী 'অর্গানাইজেশন' বা আন্তর্জাতিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বাস্তব দৃষ্টান্ত ধরা হয়। তবে রাজনৈতিক বাস্তববাদীরা (Realists) এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। যদিও- বা চলমান 'কভিড উনিশ' মহামারিতে বাস্তববাদীদের ধারণা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। কারণ, কভিড উনিশকালে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনগুলোর তৎপরতা খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয়নি। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র টিকে থাকার সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হয়েছে। এ থেকে আরেকটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, কাঁটাতার তুলে দেওয়ার লড়াইয়ে বিজয়ী হতে চাইলে প্যান- ইসলামবাদী ও উদারনীতিবাদীদের এক কাতারে আসতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমরা জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা করতে অগত্যা পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে; তবে প্যান- ইসলামিজমের ভেতর দিয়ে মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা- ব্যবস্থায় সম্মিলিত অর্থায়নের সুযোগ রয়েছে যদি এ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে একটি ইকোনোমিক চেইন তৈরি করতে পারে। শিল্প- সাহিত্যে খ্রিস্টান কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের পাশাপাশি মুসলিম লেখক- দার্শনিকরাও সাহিত্য- সিনেমায় খোরাক হয়ে উঠতে পারে সমন্বিত প্রয়াসে। 'দিরিলিস আর্তুগুল' সিরিয়ালের সম্মিলিত প্রচারকে এর প্রাথমিক বিপ্লব ধরা যায়। তবে এসব সম্ভাবনা বাস্তবে

ধরা দিবে কিনা এবং প্যান- ইসলামিজম ধারণার অগ্রসরতা কতটুকু তা নির্ভর করবে মূলত মুসলিম দেশগুলো জাতীয়তাবাদী স্বার্থ কতটুক বিলুপ করতে পারে তার উপর। শেষ কথা হলো, প্যান-ইসলামিজম ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে কোরান দিয়ে বিচার ও বৈধ করা না গেলেও মুসলমানদের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় পুঁতে রাখা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে এ আন্দোলনকে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

লেখক
মুহাম্মদ আবদুল মুকিম
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্মীয় উন্মাদনার 'পাগলা ঘোড়া'র লাগাম টানবে কে?

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

বিশ্বজুড়ে করোনার ভয়াবহতার মধ্যেও বাতাসে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষ সামান্যতমও মানবিকতার সংকট উপলব্ধি করছে না। ধর্মীয় হানাহানির কদর্যতা যেন ক্রমশ বাড়ছে। তীব্র বেগে ছুটে চলা ধর্মীয় উন্মাদনার লাগামহীন পাগলা ঘোড়াকে থামাবে কে?

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আতুড়ঘর বলা যায়। তার উপর ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর সাম্প্রদায়িকতা যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালুরুতে সম্প্রতি ভয়াবহ এক কাণ্ড ঘটে গেছে। বিজেপিপন্থী এক রাজনীতিকের নিকটাত্মীয়ের দেওয়া একটি ফেসবুক স্ট্যাটাসে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠে। আর তাতেই দাঙ্গা বেঁধে যায়। বিক্ষোভ, বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের গুলি—সবমিলিয়ে মুহূর্তেই ঝড়ে পড়ে অনেকগুলো প্রাণ। এর কয়েকদিন আগে পাকিস্তানে নবী দাবি করা এক ব্যক্তিকে বিচার চলাকালীন আদালত প্রাঙ্গণে গুলি করে হত্যা করে খালিদ নামের জনৈক যুবক। নবী দাবি করা বিষয়কে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও দ্বন্দ্ব প্রকট। কাদিয়ানী নামক একটি দল খতমে নবুয়াত বা নবী আগমনের সমাপ্তিকে স্বীকার করে না। ইসলামী অন্যান্য গোষ্ঠী এদেরকে মুসলমান মনে করে না। বিষয়টা এতটুকু পর্যন্ত যথেষ্ট হতে পারত, কিন্তু কাদিয়ানী গোষ্ঠীর সাথে অন্যান্যদের বছরজুড়ে হানাহানি লেগে থাকে। কাদিয়ানীপন্থী পরিবারের এক শিশুকে সম্প্রতি কবর থেকে তুলে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। কাজেই, নবী দাবি করা ও নবী দাবিকৃত ব্যক্তিকে খুন করা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননা আইন নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকার সত্ত্বেও আইনটি পাকিস্তানে বহাল আছে। নবী দাবি করা যদি ধর্মীয় অবমাননার আওতাভুক্ত হয়, তবে আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আদালত উল্লিখিত আইনে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে; কিন্তু বিচারবহির্ভূতভাবে এবং অপরাধ প্রমাণের আগে কাউকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করা স্বয়ং ধর্মগুলোও সমর্থন করে না। আর সে হত্যাকারী খালিদকে ইসলামের রণবীর বানানোর উগ্র প্রয়াস বিশ্বের কাছে মুসলমানদের নিয়ে ভুল বার্তা দিচ্ছে কিনা তাও ভেবে দেখছে না খালিদ সমর্থকরা।

ধর্মগুলোর উদাররূপ সাম্প্রতিককালে ধর্মানুসারীরা প্রায় ভুলতে বসেছে। ভারতের অযোধ্যায় ৫০০ বছরের পুরোনো বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির বানানোর পক্ষে কাজ করছে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকার। সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্রীয় মদদে চলছে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ। কথিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'গণতান্ত্রিক' ও 'অসাম্প্রদায়িক' রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন যে **"ভগবান রামের কাজ না করলে আমার শান্তি কিসে হবে?"**—এ দৃশ্য বড়ই আশ্চর্যের! ভারতের আদালত মেনে নিয়েছে যে, ৫০০ বছর ধরে এ জায়গায় মসজিদই ছিল; কিন্তু ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরে বিজেপিপন্থী জঙ্গিদের হামলায় মসজিদটিকে ভেঙে ফেলা হয়। এ নিয়ে আদালত নিন্দাও করেছে। অথচ এরপরেও আদালত মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দিয়েছেন! বিচারপতিরা ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) একটি রিপোর্টও উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছিল বাবরি মসজিদের নিচে একটি স্থাপনা ছিল বলে প্রমাণ মিলেছে—তবে সেই কাঠামোটি ঠিক কিসের, তা স্পষ্ট নয়। এমন একটি অস্পষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্র করে যখন কোনো কথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সাম্প্রদায়িক রায় দেয়, তখন আর বুঝার বাকি থাকে না যে, দেশটির বিচারবিভাগ, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের গর্ভনরসহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসনে বসা সকল ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে কাজ করছেন। আবার এ রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও আরেক কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শিবসেনার আন্তঃকোন্দলও তীব্র!

ধর্মীয় হানাহানির চিত্র যে শুধু উপমহাদেশে এমন প্রখর তা নয়; সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বিরাজ করছে সাম্প্রদায়িকতার রুদ্ররূপ। তুরস্কের হাইয়া সোফিয়া বা আয়া সোফিয়া যে খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ শতকে তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ক্যাথিড্রাল ছিল, এ কথা সবাই মানে। পরে তৎকালীন কন্সটান্টিনোপল বিজয় করে করে ইস্তাম্বুল প্রতিষ্ঠা করে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসকরা। তখন এ ক্যাথিড্রাল কিনে নিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন ওসমানীয় শাসকরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের উত্থান ঘটলে আয়া সোফিয়াকে মিউজিয়ামে রূপান্তর করা হয়। পরে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। অনেকটা বাবরি মসজিদকেন্দ্রিক রায়ের মতো মিলিয়ে তুরস্কের আদালত এটিকে মসজিদে

“গ্রিসের এথেন্স ইউরোপের একমাত্র রাজধানী যেখানে এখনও কোনো অফিসিয়াল মসজিদ নেই। তবে হেমন্তের শেষে একটি মসজিদ উদ্বোধনের কথা রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি তুরস্কে আয়া সোফিয়াকে জাদুঘর থেকে মসজিদে রূপান্তরের ঘটনায় এথেন্সের মসজিদ উদ্বোধন আরো পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সেখানকার মুসলমানরা।” ইমাম আতা- উল নাসের নামের এথেন্সের একটি অস্থায়ী মসজিদের ইমামকে উদ্ধৃতি করে তারা লিখেছেন, **“এই ঘটনার পর আমার মনে হচ্ছে গত দশ বছর ধরে আমরা যে মসজিদের জন্য অপেক্ষা করছি সেটা চালু করা আরো কঠিন হয়ে উঠতে পারে।”** স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, তুরস্কের স্থানীয় মুসলমানদের জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসেবে ‘অহং’- এর জয় হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য এ রায় উদ্বেগের। ভারতে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় উগ্র হিন্দুদের দাবি, এ জায়গা হিন্দুধর্মীয় ভগবান শ্রী রামের জন্মস্থান; আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরের পক্ষে কট্টর ধর্মপন্থীদের দাবি, এ জায়গা তাদের পূর্বপুরুষদের খরিদকৃত নিজেদের সম্পত্তি। মূলত এভাবে ঐতিহাসিক বিবেচনায় বিরোধটা বাঁধে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) যে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার রাজনীতি আছে, আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরের পেছনেও তুরস্কের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টির (একেপি) একই জাতীয় রাজনীতি রয়েছে। বাবরি মসজিদকে রাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি বসেছিল দিল্লির মসনদে; তুরস্কের বিগত স্থানীয় নির্বাচনে আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরের ইস্তেহার দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতে নেয় একেপি। দুই দেশেই ধর্মীয় উন্মাদনার সদ্ব্যবহার করেছে জাঁদরেল রাজনীতিকরা।

ইজরায়েল- ফিলিস্তিন যুদ্ধ নতুন করে প্রকট হচ্ছে। মূলত জেরুজালেম- কেন্দ্রিক এ যুদ্ধের সূচনা ১৯৬৭ সালে; সেবারই প্রথম আরব- ইহুদী বা আরব- ইজরায়েল যুদ্ধ লাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হলোকাস্ট গণহত্যার স্বীকার ইহুদীদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে সেবারে বিশ্ব নেতৃত্বের সহানুভূতি ছিল ইজরায়েলের পক্ষে। সে- সুবাদে তারা স্বাধীন ভূখণ্ডও অর্জন করে নেয়। কিন্তু ক্রমশ তারা উগ্র ইহুদীবাদী রূপ দেখাতে থাকে। মুসলিম- খ্রিস্টান- ইহুদী তিন ধর্মের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান জেরুজালেম। কিন্তু ইজরায়েল এ স্থানকে নিজেদের করে নেওয়ার পায়তারা সে- শুরু থেকেই করে আসছে। শেষ পর্যন্ত চলতি বছরে জেরুজালেমকে তারা নিজেদের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে।

অবশ্য ছাড় দেওয়ার মানসিকতা লঘু ছিল ফিলিস্তিনি আরবদের মাঝেও। অথচ সব ধর্মীয় জনগণ স্ব- স্ব অবস্থান থেকে ছাড় দিলে প্রধান তিন ধর্মের অনুসারীরা জেরুজালেমকে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারত!

করোনাভাইরাসের প্রথম ধাক্কায় সর্বোচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকারীদের তালিকায় অনেকদিন যাবৎ শীর্ষে ছিল ফ্রান্স। মূলত এর পেছনেও ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা। ডাব্লিউএইচও (WHO) ঘোষিত করোনার ভয়াবহতার কঠোর হুশিয়ারি সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ফ্রান্সের মুলহাউস শহরে ক্রিশ্চিয়ান ওপেন ডোর গির্জায় অর্থডক্স খ্রিস্টানদের হাজার হাজার সদস্য নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আর এদের মধ্যে যেকোনো একজন ছিল করোনা আক্রান্ত। এর মাধ্যমেই ফ্রান্সজুড়ে করোনা খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে এবং এর চড়া মূল্য হিসেবে ফ্রান্স মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় অল্পদিনের মাঝে। ভারত- পাকিস্তান- মালেশিয়ায় তাবলীগের সমাবেশ থেকে বিশাল পরিমাণে করোনা ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে। ইসরায়েলের সাবেক রাজধানী তেল আবিবের পাশের বেনি ব্রাক নামের যে- শহরে গোঁড়া ইহুদীদের বাস, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে- অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সমাবেশ থেকে প্রকট আকারে করোনা ছড়ানোর অভিযোগ আছে। সবমিলিয়ে পৃথিবীজুড়ে সব ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনার চিত্র প্রায় অভিন্ন।

স্রষ্টায় বিশ্বাসী সব ধর্মের আদিপুরুষরা মূলত মানবিকতার শিক্ষা দিয়েছেন নিজ নিজ যুগে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ঐশীবাণীও উদারতা- মানবিকতার পক্ষে। কিন্তু এসব ছাপিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনার করাল গ্রাস ক্রমশ পৃথিবীকে অবাসযোগ্য করে তুলছে। ইজরায়েল- ফিলিস্তিনের চরম দ্বন্দ্বের মাঝেও ইজরায়েলি ও ফিলিস্তিনি নারীদের যৌথ উদ্যোগে শান্তির সুবাতাসের পক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাদেরকে অনুসরণীয় জায়গায় রেখে ধর্মীয় কদর্য বাড়াবাড়ি ভুলে সব ধর্মীয় অনুসারীরা একই

শান্তির সামিয়ানায় আসতে না পারলে আগামীর বিশ্বে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ও হানাহানির ফলে সৃষ্ট সংকট আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।

লেখক
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
সমাজকর্মী ও সংবাদকর্মী

সত্য প্রতিষ্ঠায় অনন্য ত্যাগ: হিজরত

আবু মুহাম্মদ মুশফিক ইলাহী

'তারিখ' শব্দটি আরবি। এর প্রচলিত অর্থ ইতিহাস, বছরের নির্দিষ্ট দিনের হিসাব। আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আরবি অভিধান *'লিসানুল আরবে'* লিখেছেন, তারিখ হলো সময়কে নির্দিষ্ট করা, সময়ের ঘটনা প্রবাহকে শব্দবদ্ধ করা। আল্লামা সায়দাভি (রহ.) বলেছেন, 'তারিখ' শব্দটি 'আরখুন' থেকে এসেছে; যার অর্থ নবজাতক। ইতিহাসের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হলো, নবজাতকের জন্মের মতো ইতিহাসও সৃজিত হয়, রচিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, 'তারিখ' শব্দটি অনারবি। 'মাহ্' ও 'রোজ' থেকে পরিবর্তন করে একে আরবিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর অর্থ : দিন, মাস, বছরের হিসাব।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সংখ্যা গণনা, হিসাব সংরক্ষণের সঙ্গে ইতিহাসের সখ্য অনেক গভীর। সন- তারিখ হলো ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনচরিত রচনা ও সময়ের আলোচনা- পর্যালোচনা সন- তারিখ ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও এটি ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য নয়, তবু সন- তারিখ প্রথা ইতিহাসের অনুষঙ্গ হয়ে আছে সেই আদিকাল থেকে। ফলে ইতিহাস বোঝাতে 'তারিখ' শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়।

প্রাক ইসলামী যুগে আরবের সমষ্টিগত কোনো তারিখ ছিল না। সে সময় তারা প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে বছর, মাস গণনা করত। হযরত ইবরাহিম (আ.)- এর সন্তানরা পবিত্র কাবা নির্মাণের পূর্বে তাঁর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা অবলম্বনে তারিখ নির্ধারণ করতেন। কাবা শরিফ নির্মাণের পর তাঁরা বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত এর আলোকেই সাল গণনা করতেন। তারপর বনু ইসমাঈলের যারা হেজাজের তেহামা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যেত, তখন সেই গোত্র হতে বেরিয়ে যাওয়ার দিন থেকে তারিখ গণনা করত। যারা তেহামাতে রয়ে যেত তারা বনি জায়েদ গোত্রের জুহাইনা, নাহদ ও সাদের চলে যাওয়ার দিন থেকে সাল গণনা করত। কাব বিন লুআই'র মৃত্যু পর্যন্ত এ ধারা চলমান ছিল। পরে তাঁর মৃত্যুর দিন থেকে নতুনভাবে সাল গণনা শুরু হয়। এটি চলতে থাকে হস্তী বাহিনীর ঘটনা পর্যন্ত। হজরত উমর (রা.) হিজরি নববর্ষের গোড়াপত্তন করার আগ পর্যন্ত আরবে 'হস্তীবর্ষ'ই প্রচলিত ছিল[১]।

বনু ইসমাঈল ছাড়া আরবের অন্য লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে উপলক্ষ করে বর্ষ গণনা করত। যেমন- বাসুস, দাহেস, গাবরা, ইয়াওমু জি- কার, হরবুল ফুজ্জার ইত্যাদি ঐতিহাসিক যুদ্ধের দিন থেকে নতুন নতুন বর্ষ গণনার সূত্রপাত করত। গোটা বিশ্বের ইতিহাস হতে দেখা যায়, পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে বর্ষপঞ্জি গণনা শুরু করা হয়। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে আগমনের দিন থেকে সাল গণনা শুরু। এ ধারা চলতে থাকে হজরত নুহ (আ.)- এর মহাপ্রলয় পর্যন্ত। এরপর মহাপ্রলয় থেকে নতুন বর্ষপঞ্জি তৈরি করা হয়। এটা চলতে থাকে ইবরাহিম (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত। এ বর্ষপঞ্জি চলতে থাকে ইউসুফ (আ.) মিসরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। সে ঘটনা থেকে শুরু হয় নতুন বর্ষ গণনা। এটি চলতে থাকে মুসা (আ.) মিসর ত্যাগের ঘটনা পর্যন্ত। সেটি চলতে থাকে দাউদ (আ.)- এর শাসনামল পর্যন্ত। সেটি চলতে থাকে সুলাইমান (আ.)- এর রাজত্বকাল পর্যন্ত। সেটি চলতে থাকে হজরত ঈসা (আ.)- এর যুগ পর্যন্ত। ঈসা (আ.)- এর জন্ম থেকে নতুন বর্ষ গণনা শুরু হয়। আরবের হিময়ার গোত্র ইয়াওমে তাবাবিয়াহ (ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিন) থেকে, প্রাচীন আরবের গাসসান গোত্র বাঁধ নির্মাণের দিন থেকে সাল গণনা করে। সানা অধিবাসীরা হাবশিদের ইয়েমেন আক্রমণের দিন থেকে বর্ষ গণনা শুরু করে। তারপর তারা পারস্যদের জয়লাভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাল গণনা করে[২]।

পারসিকরা তাদের রাষ্ট্রনায়কদের চার স্তরে বিন্যস্ত করে সাল গণনা করত। রোমানরা পারসিকদের কাছে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত *'দারা ইবনে দারা'* নিহত হওয়ার দিন থেকে সাল গণনা করত। কিবতিরা মিসরের রানি *'কিলইয়ুবাতরাকে'* রুখতে *'বুখতে নছর'* কর্তৃক সাহায্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাল গণনা করত। ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাসে হামলা এবং এটি তাদের হাতছাড়া হওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করে বর্ষ গণনা করে। খ্রিস্টানরা হজরত ঈসা (আ.)- কে আসমানে উত্তোলনের ঘটনাকে স্মারক বানিয়ে খ্রিস্টবর্ষ পালন করে[৩]। যখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নবুওয়াত প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন, তখন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষেরাও (বংশের লোক) বিরোধিতা শুরু করে।

তিনি গোপনে তিন বছর দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করার পর আল্লাহর নির্দেশে সাফা পাহাড়ে প্রকাশ্যে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন থেকেই পথে প্রান্তরে তাকে আহত, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করা শুরু হয়েছিল। অত্যন্ত ধৈর্য ও পরম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। যখন তাঁকে সত্যেও পথ হতে সরানো যাচ্ছিলো না, তখন তারা *'দারুন নাদওয়ার'* বৈঠকে প্রিয়নবিকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঘোষণা করা হয়, তাঁকে জীবিত বা মৃত নাদওয়া গৃহে উপস্থিত করতে পারলেই পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে ১০০টি উট। এ ঘোষণায় একদল শক্তিশালী যুবক ঐকমত্য পোষণ করল যে, সে রাতেই তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে।

৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ২৭ সফর। সে রাতেই মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের ফলে আল্লাহর নির্দেশে প্রিয়নবি মক্কা মুকাররামা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮ রবিউল আউয়াল মদিনার পাশ্ববর্তী স্থান কুবায় এসে পৌঁছেন। অবশেষে ২৭ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১২ রবিউল আওয়াল মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মদিনাবাসী প্রিয়নবির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন। তারা প্রিয়নবীকে সাদরে বরণ করে নেন। এ হিজরতেরই স্মৃতিবহন করে আসছে আরবি হিজরি সন।

আলবিরুনির বিবরণী থেকে জানা যায়, হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) একটি পত্রে উমর (রা.)-কে অবহিত করেন, 'সরকারি চিঠিপত্রে সাল-তারিখ না থাকায় আমাদের অসুবিধা হয়।' বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে হজরত উমর (রা.) একটি সাল চালু করেন। আল্লামা শিবলি নোমানি (র.) হিজরি সালের প্রচলন সম্পর্কে *আল ফারুক* গ্রন্থে উল্লেখ করেন: হজরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে ১৬ হিজরি সালের শাবান মাসে খলিফা উমরের কাছে একটি দাপ্তরিক পত্রের খসড়া পেশ করা হয়, পত্রটিতে মাসের উল্লেখ ছিল; সালের উল্লেখ ছিল না। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, পরবর্তী কোনো সময়ে তা কীভাবে বোঝা যাবে এটি কোন সালে পেশ করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে হজরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানী-গুণীকে নিয়ে আলোচনা করে মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের বছর থেকে সাল গণনা করার

সিদ্ধান্তে উপনীত হন। হিজরতের বছর থেকে সাল গণনার পরামর্শ দেন হজরত আলী (রা.)। পবিত্র মহররম মাস থেকে ইসলামি বর্ষ হিজরি সালের শুরু করার ও জিলহজ মাসকে সর্বশেষ মাস হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন হজরত উসমান (রা.)[৪]

বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে হিজরতের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ কী? অথচ মহানবী (সা.)- এর নবুয়তপ্রাপ্তিসহ আরো একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সন গণনা শুরু করা যেত। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) বলেন : সুহাইলি (রহ.) এ বিষয়ে রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন, সাহাবাগণ সন গণনার বিষয়ে হিজরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সুরা তাওবার ১০৮ নম্বর আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। এই 'প্রথম দিন' ব্যাপক নয়। এটি রহস্যাবৃত। এটি সেই দিন, যেদিন ইসলামের বিশ্বজয়ের সূচনা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিরাপদে, নির্ভয়ে প্রভুর ইবাদত করেছেন। মসজিদে কোবার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফলে সেদিন থেকে সন গণনার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম মতৈক্যে পৌঁছেছেন[৫]। তিনি আরো বলেছেন, মহানবী (সা.)- এর জন্ম, নবুয়ত, হিজরত ও ওফাত এ চারটির মাধ্যমে সন গণনা করা যেত। কিন্তু জন্ম ও নবুয়তের সন নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে, আর মৃত্যু শোকের স্মারক। তাই অগত্যা হিজরতের মাধ্যমেই সন গণনা শুরু করা হয়।

মহররম থেকে হিজরি সন গণনা শুরু করার কারণ হলো, আল্লামা সালমান মনসুরপুরি লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ৫৩ বছর বয়সে নবুয়তের চতুর্দশ বছর ৮ রবিউল আউয়াল, সোমবার কোবা নগরীতে অবতরণ করেছেন। ইংরেজি হিসাবে যা ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ সাল[৬]। । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হিজরত হয়েছে রবিউল আউয়াল মাসে। তাহলে হিজরি বর্ষ মহররম মাস থেকে কেন শুরু করা হয়? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লিখেছেন, অতঃপর তারা হিজরত থেকেই সন গণনা শুরু করল। আর মহররমকে প্রথম মাস হিসেবে স্বীকৃতি দিল। কেননা, তৎকালীন আরবে মহররমই প্রথম মাস হিসেবে পরিচিত ছিল। জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে বিঘ্ন না হয়, সে জন্য এটিকে পরিবর্তন করা হয়নি[৭]। আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) লিখেছেন,

রবিউল আউয়ালকে বাদ দিয়ে মহররম থেকে সন গণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, হিজরতের সূচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে মহররম থেকে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথও হয়েছে মধ্য জিলহজে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথ হিজরতকে ত্বরান্বিত করে। আর এ ভগ্ন মাসের পর নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে মহররম মাসে। তাই একে দিয়েই বছর গণনা শুরু করা হয়েছে। আমার জানামতে, এটি দৃঢ়তম অভিমত[৮]।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হজরত উমর (রা) কর্তৃক হিজরি সন প্রবর্তিত হওয়ার এক বছর পরই আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও হিজরি সনের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ৫৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে বাংলার জমিনে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সূচিত হয়। এর ফলে হিজরি সন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের মাধ্যমে জাতীয় সন গণনায় পরিণত হয়। সন গণনায় ৫৫০ বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর থাকার পর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের মধ্যমে হিজরি সনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অবসান হয়।

বর্তমান সময়েও বাংলাদেশ জনসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম দেশ। কিন্তু, দেশের সরকার কর্তৃক হিজরি নববর্ষ পালনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা এবং এই দিনকে রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া বড়ই দুখঃজনক। কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা জোট কেউ ইসলামী নববর্ষ হিজরি সন পালনের উদ্যোগ নেয়নি। দেখা যায়নি পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করতেও। সংবাদপত্র বের করেনি বিশেষ সংখ্যা, আয়োজন নেই কোনো মিডিয়াতে বিশেষ অনুষ্ঠানের। এ অবস্থায় চট্টগ্রামে হিজরি নববর্ষ উদযাপন পরিষদ ও 'জাতীয় হিজরী নববর্ষ উদযাপন পরিষদ' এর ব্যানারে দেশের ৫টি বিভাগীয় শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে যে অনুষ্ঠান হয়ে আসছে তা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। বিশ্বশান্তির দূত ও কল্যাণের প্রতীক রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র স্মৃতিবিজড়িত সন গণনার প্রতি সম্মান জানিয়ে ১ মহররম ছুটি ঘোষণা করে সরকারিভাবে হিজরি সন উদযাপনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

তথ্যসূত্রঃ

১. আল- কামেল লি ইবনিল আসির : ১/৯
২. আল- ইলান, লিস সাখাভি : ১৪৬- ১৪৭
৩. আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা : ১০/২৮ 'তারিখ'
৪. বুখারি ও আবু দাউদ
৫. ফতহুল বারি : ৭/২৬৮
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৫১৩
৭. ফতহুল বারি : ৭/২৬৮

লেখক
আবু মুহাম্মদ মুশফিক ইলাহী
চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, ইংরেজি বিভাগ।
প্রকাশিতব্য বই- **মুনিবের সকাশে**।

ধর্ম

প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন

এম এয়াকুব আলী বাদশা

'সফলতা' বিষয়টার নিরীক্ষণ ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নরকমের হয়। কারো কাছে উচ্চ শিক্ষা, কারো কাছে সামাজিক উচ্চাবস্থান, ক্ষমতার আকাঙ্খা, আবার কারো কাছে ধনদৌলতের প্রাচুর্যই হলো জীবনের প্রকৃত সফলতা।

কিন্তু যিনি এই মহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; রাব্বুল আলামিন এর কুদরতি নজরে সফলতা কী? ইরশাদ হচ্ছে-

"হে আমাদের রব, আর আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে পাপ হতে রক্ষা করুন, আর সেদিন আপনি যাকে পাপের শাস্তি / আযাব হতে রক্ষা করবেন, তাকেই তো অনুগ্রহ করবেন। আর এটাই তো মহাসাফল্য"।[১]

আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিচ্ছেন, কীভাবে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে পাপে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করে জান্নাতের সুশোভিত জীবনকে আপন করে পাওয়া যায়। আর পৃথিবীতে সৎকর্ম করে চিরস্থায়ী শান্তির ঠিকানায় পৌঁছতে পারাকেই আল্লাহ পাক বলছেন মহাসাফল্য।

তবে এই সাফল্যকেই কি 'রেজায়ে ইলাহি' বলা যায়? উত্তর হলো- রেজায়ে ইলাহি আসলে ভিন্ন একটা প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তিতে রয়েছে নিজের প্রভুর নুরকে আপন হৃদয়ে ধারন করতে পারার পরম অমৃত সুধা। জান্নাত লাভের চেষ্টা করা এবং জান্নাতের স্রষ্টার প্রেম অর্জনের চেষ্টার মধ্যে রয়েছে বিরাট ফারাক। রেজায়ে ইলাহি কবরের আযাব, বা আখেরাতে মিজানের পাল্লা কিংবা জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুন থেকে বাঁচতে চাওয়ার নাম নয়। হৃদয়-কাননে প্রভু-প্রেমের গোলাপ প্রস্ফুটিত করা, দুনিয়ার প্রাচুর্যতা বিলীন করে প্রভুর প্রেমে বিলীন হয়ে যাওয়া, দুনিয়ার সমস্ত মোহকে প্রভুর প্রেমের কাছে পরাভূত করা, ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি প্রদক্ষেপই প্রভুর ইয়াদগারির উপর থাকা,

প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভুর সন্তুষ্টচিত্তের প্রতি উদগ্রীব হয়ে থাকা। মূলত জীবন নামক মহাপ্রাণকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর রঙে রঙিন করাকে 'রেজায়ে ইলাহি' হিসেবে প্রতিবেদিত করা যায়।

ইরশাদ হচ্ছে-

"তোমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হও। কেননা, তাঁর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে?"[২]

প্রভুর রঙের মতো রঙ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারোরই হতে পারেনা; সম্ভবও না। সেই রঙে রঙিন হওয়ার পূর্ণ মনোস্কাম বা তাড়না একজন ব্যক্তিকে 'রেজায়ে ইলাহির' দিকে ধাবিত করে। 'রেজায়ে ইলাহি' অর্জন করার অন্যতম শর্ত হলো 'মুমিনে কামেল' হওয়া। আর মুমিনে কামেল হওয়ার শর্ত স্বরুপ হযরত রাসুল পুরনুর (দ:) বলেন, **"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তোমাদের স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য সমস্ত কিছু হতে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হবো।"**[৩]

'মুমিনে কামেল' হয়ে 'রেজায়ে ইলাহি' পাওয়ার জন্য কীভাবে, কোন পথে, কাদের অনুসরণ করতে হবে তা রাব্বুল আলামিন সহজবোধ্য ভাষায় পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়ে বলছেন-

"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখান / সরল সঠিক পথের হেদায়ত দিন/ সরল সঠিক পথের উপর অটল রাখুন। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন / যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।"[৪]

রাব্বুল আলামিনের সুস্পষ্ট বর্ণিত তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

"যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গলাভ করবে যাঁদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন- অর্থাৎ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ(সত্যনিষ্ঠগণ), শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। তাঁরা কতই উত্তম সঙ্গী।"[৫]

সুতরাং, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকে সামনে রেখে 'রেজায়ে ইলাহি' যারা অর্জন করেছেন সেই সৎকর্মশীল / সত্যান্বেষীরা সাথী হিসেবে আখিরাতে সাথে পাবেন নবীগণকে, সত্যের সিদ্দিকগণকে, শহিদগণকে। 'রেজায়ে ইলাহি'র মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ব্যক্তি যেমন তাঁর নিজের ক্বলব আল্লাহর আরশে সম্পূর্ণীকৃত করেন আবার শেষ মিলনের দিবসে নবী, সিদ্দিক, শহিদ, সালেহিনদের সঙ্গী হয়ে প্রভুর সম্মুখে অধিষ্ঠিত

হওয়ার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্রঃ

১।সূরা আল- মুমিন: ৮- ৯ নং আয়াত।
২।আল বাকারাহ:১৩৮
৩।কিতাবুল ঈমান:বোখারী, ও মুসলিম
৪। সুরা ফাতেহা- ৬- ৮
৫।সুরা নিসা ৫৯

লেখক
এম এয়াকুব আলী বাদশাহ
অর্থনীতি বিভাগ,
সরকারী হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

ধর্ম

চোখের পবিত্রতা রক্ষা

এম হুমায়ুন কবির

আমরা অনেকেই সুন্দরী মেয়ে দেখলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকি, আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুকে বলি, "দোস্ত আমি না ঐ মেয়েটির ওপর ক্রাশ খেয়েছি।" 'ক্রাশ' খাওয়ার মানেটা হলো মেয়েটার রূপ দেখে আত্মহারা হয়ে পড়া। কল্পনার জগতকে শুধু সেই মেয়েটিরই পদচারণে মুখরিত করে তোলা। নিজেকে সম্রাট শাহজাহান আর মেয়েটিকে মমতাজ ভাবতে শুরু করা। ক্লাস চলাকালীন সময়ে তাকে একনজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়া। সকাল সন্ধ্যা তাকে নিয়ে ভাবভাবতে সময়ের সবটুকু খরচ করে ফেলা। ধর্মীয় অর্থে না বললেও কবিগুরু ঠিকই বলেছিলেন,

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ"

কবিগুরুর সাথে অদ্য আলোচনার পার্থক্যটা হলো, কোন নারীর চোখে আমার সর্বনাশ না দেখলেও, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নারীর চোখের দিকে তাকানোটা আমার সর্বনাশের অন্যতম কারণ। দোষটা তাই নারীর চোখে না; আমার চোখে, আমার চিন্তায়, মনে–মননে। পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন, **"হে আমার প্রিয় হাবিব, আপনি (পুরুষ) মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।"**[১] আর এই 'ক্রাশ' নামক থিউরিকেই আল্লাহ'র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যিনা' বলেছেন[২]।

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো বেগানা নারীর দিকে নোংরা দৃষ্টিতে তাকানোর কোন অধিকারই আমার নেই। আমার সংবিধানই (আল কুরআন) আমাকে এই কাজের ব্যাপারে শক্তভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। আবার রাসূলে পাক বলেছেন, **"কোন নারীর দিকে যদি দৃষ্টি চলে যায় তাহলে তা সাথে সাথে ফিরিয়ে নাও। ভুলেও দ্বিতীয় বার যেন মুখ তুলে না তাকাও।"**[৩] কেননা, শয়তান চায় দ্বিতীয়বার তাকানোর মধ্য দিয়ে যে- কোন ধরনের পাপকাজে আমাদেরকে শামিল করতে।

লক্ষ করুন, এই যে একজন মহিলার দিকে বারংবার তাকানো, এটাকে আল্লাহ তায়ালা চোখের খিয়ানত বলেছেন। জেনে থাকা আবশ্যক যে, চোখ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার পক্ষ হতে

যদি সেই আমানত দিয়ে ভুল কিছু দেখি তা হবে খিয়ানত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ' লা বলেন, **"কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে (বিচার দিবসে) দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।**[৪]

এই ক্রাশ নামক রোগ থেকে বাঁচার একটাই উপায়, তাহলো তাওবা করা। আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া, আশ্রয় এবং সুরক্ষার ভিক্ষা চাওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন, **"আল্লাহ'র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।"**[৫] আরেকস্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"আর আল্লাহ যার ইচ্ছা তাওবা কবুল করবেন এবং আল্লাহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়।"**[৬] তাই সময় থাকতে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। তাওবা করে কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাভিক্ষা চাইতেই হবে। আর যারা ফিরে আসবে তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সুসংবাদ প্রদান করে বলেন, **"তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন নিজ দয়া ও আপন সন্তুষ্টির এবং ওই সব বাগানের (জান্নাত), যেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত রয়েছে।"**[৭]

সুতরাং, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে চোখকে এবং সেই সাথে সমাজকে সুরক্ষা প্রদান করার তাওফিক দান করুন। তাঁর বারগাহে ইলাহিতে সকাল-সন্ধ্যা, ফরজ, নফল, তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এবং নিজের জন্য ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ করে দেন। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন এবং বিগত সময়ের পাপ মোচন করে সরল, সঠিক পথে নিজেকে চালানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্রঃ

(১) সূরা নুর, আয়াতঃ ৩০,
(২) সুনানে আবু দাউদঃ২১৫১,
(৩) সহিহ বুখারী: ৬২৪৩, ৬৬১২; সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭,
(৪) সূরা যিলযাল, আয়াত- ৭-৮
(৫) সূরা যুমার- ৫৩
(৬) সূরা তাওবা: আয়াত - ১৫,
(৭) সূরা তাওবাঃ আয়াত- ২১,

লেখক
এম হুমায়ুন কবির
চট্টগ্রাম কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

জীবন

শুভ্রা চক্রবর্তী

অতীতের স্মৃতিকে বাক্সবন্দি অতীতে পুরে বর্তমানের ভেলায় বহুদূর ভাসিয়ে দিয়ে চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে জয়ের হাসি হাসতে পারলে ভাববেন, ওই বাক্সবন্দি অতীতের নাম- 'অভিজ্ঞতা'।

ঘরছাড়া পথিকের মতো পথে নেমে হেঁটে আসা পথের দিকে একরাশ দুঃখ নিয়ে তাকিয়ে ফের ফিরতে চাওয়ার নাম- 'মায়া'।

ঘরের পাশে লাগানো চারা গাছটিতে রোজ বিকেলে নিয়ম করে পানি দেবার ফলস্বরূপ একসময় সে ফুলে- ফলে পরিপূর্ণ হয়ে আপনাকে তৃপ্ত করে, এর নাম- 'দায়বদ্ধতা'।

একটা মানুষ যেখানে বাঁচে- বাড়ে, যেখানটায় তার আহ্লাদ- আক্ষেপ, যেখানটায় সে ঠোঁটচাপা কান্নায় নিজেকে ভাসিয়ে আবার বুকভরা হাসিতে মেতে ওঠে- ওটার নাম 'সম্পর্ক'।

আপনার মন খারাপের সবকটা দিনে ঐ যে আকাশটা মেঘলা হবে না জেনেও তার দিকে নিষ্পাপ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আপনার নিঃস্বার্থ নিগুঢ় অনুভূতিগুলো যখন নীরবেই প্রকাশ করেন- তার নাম 'ভালোবাসা'

আজকে বাঁচবেন কিনা সেটা অনিশ্চিত জেনেও কাল কী করবেন সেটা প্ল্যান করে রাখার নামই- 'বিশ্বাস'।

হাজারো বেরোতে চাওয়া কথারা যখন অব্যক্তই থেকে যায়, তখন তার নাম- 'দীর্ঘশ্বাস'।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, চারপাশের মানুষগুলোর কটূ কথা যখন আপনাকে সুদীর্ঘ এক বিষাদ সাগরে ভাসিয়ে দেয়, তখন যে বিষয়টিকে আঁকড়ে ধরে স্রোতের বিপরীতে আপনি একাই লড়াই করে যান, তার নাম- 'স্বপ্ন'

'স্বনির্ভরতা' গড়ে তোলার গল্পটা একটা 'অভিজ্ঞতা'। 'মায়া' কষ্ট নামক 'দীর্ঘশ্বাস' এসব 'সম্পর্কের' এক একটা অংশ। এই সম্পর্কের মাঝে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো 'বিশ্বাস'। আর বিশ্বাস আসে 'ভালোবাসা' থেকে। আবার যে বিষয়টিকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তা হলো- স্বপ্ন।

অতঃপর ..

এই স্বনির্ভরতা, অভিজ্ঞতা, মায়া, দায়বদ্ধতা, সম্পর্ক, ভালোবাসা, দীর্ঘশ্বাস, বিশ্বাস এবং স্বপ্নের সম্মিলিত রূপকে আমরা বলি 'জীবন'।

লেখক
শুভ্রা চক্রবর্তী
চট্টগ্রাম কলেজ, বাংলা বিভাগ
আবৃত্তি শিল্পী, ক্বণন শুদ্ধতম আবৃত্তি অঙ্গন।

নারী

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার স্বত্তের আইন

মোহাম্মদ আবদুল আলিম

অধুনা সমাজে কিছু মানুষ তাদের নির্ধারিত অশুভ বাক্যাবলিকে বন্দি খাঁচার মধ্যে আটকে রেখে অনর্গল বলতে চেষ্টা করে যে, ইসলাম নারীজাতিকে যথাযথ আত্মাধিকার দিতে সক্ষম হয়নি এবং ইসলামে নারীকে পুরুষের অর্ধেক বানিয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো- সত্যতা এবং ইতিহাস অন্য কিছু বলে। প্রথমে বলে রাখি, ইসলাম মানবতার জন্য যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা এবং অধিকারের শুভ বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যেখান থেকে নারীকে না কোনোরকম বঞ্চিত রাখা হয়েছে, না কোনোরকম অবজ্ঞা করা হয়েছে বরং সম্মানের সুউচ্চ শিখরে উপনীত করেছে।

অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিরা কুরআনের একটি আয়াতকে এই বিষয়ে উপস্থাপন করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন, **“একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার অংশের সমান।”**[১] আপনার কাছে বোধহয় যথাযথ মনে হচ্ছে না, তাই না? আসলে সত্যি বলতে, যে কেউ বিজলির আলোকরশ্মিতে চমকে উঠবে। বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বোকামির কাজ; ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আয়াতটি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত। আর ইসলামের উত্তরাধিকার সূত্রের আইনকে যারা সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে, কোন গভীরতা এবং বিশ্লেষণ করে দেখে না, তাদের এই ভুল হয়। এবং বলে দেয় যে , ‘ইসলামে নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে কম’। এই কথাটি বিজ্ঞানময় কুরআনের যথাযথ প্রজ্ঞার সহিত বোধগম্য না করার ফল। যদিওবা আয়াত থেকে জানতে পারি **‘একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার অংশের সমান’**, তা সত্ত্বেও ইসলামের উত্তরাধিকারস্বত্ত্বের আইনকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যালাচনা করলে এই ভুলটি তিরোহিত হবে। ইসলামের উত্তরাধিকার স্বত্তের আইন নারীর অধিকারকে অর্ধেক কিংবা হালকা নয় বরং সুন্দর দাম্পত্য এবং উত্তম জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের উত্তারাধিকার স্বত্ত্বের আইন নারীর পবিত্রতা এবং মর্যাদার রক্ষাকবচ বলা যায়। নিম্নোক্ত তাৎপর্যসমূহ এই আইনে নিহিত রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত আয়াতের শব্দের মধ্যে গভীর দৃষ্টিপাতের ফলে বণ্টনের মৌলিক মাপকাঠিকে স্পষ্ট করে দেয়। এখানে পুরুষ- মহিলার উত্তরাধিকার অংশ বর্ণনা করতে, নারীর অংশকে একমাত্র সাব্যস্থ করা হয়েছে। একজন পুরুষের অংশ দুই মহিলার অংশের সমান। এটা বলা হয়নি যে, একজন মহিলার অংশ পুরুষের অর্ধেক অংশের সমান। বরং উত্তারাধিকার স্বত্ব বণ্টনের শৃঙ্খলার মধ্যে নারীর অংশকে ভিত্তি করা হয়েছে । অতঃপর, সমস্ত অংশকে নির্দিষ্ট করার জন্য সেটাকে একমাত্র করা হয়েছে। বস্তুত স্বত্ব বন্টনের সকল আইন মহিলার অংশের চারপাশেই ঘুরছে, যেটা প্রকৃতপক্ষে নারীর সম্মান আর মর্যাদার প্রকাশক। উত্তরাধিকার স্বত্বের অংশ নির্ধারণ লিঙ্গভেদে হয় না। আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর সকল প্রয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক করেছেন, আর নারীকে সেই দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছেন। নারীর জন্য রোজগার ও জীবিকার ক্ষেত্র থেকে সম্ভাব্য সকল উপকারিতা অর্জন করার ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি, বরং নারী যদি উপার্জনকারীও হয়, তবুও তত্ত্বাবধানের দায়দায়িত্ব তার স্বামীর উপরই বর্তাবে। আর নারী নিজের রোজগার বিশেষ অধিকার হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। আর সে ঘরোয়া প্রয়োজন মেটানোর জন্য খরচ করতে চাইলে তার এই ভূমিকা বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা এটা তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। পুরুষের আয় নারীর উপার্জনের চেয়ে কম হলেও তত্ত্বাবধানের দায়দায়িত্ব পুরুষের উপরই বর্তাবে। অভ্যন্তরীণ অবস্থার দায়দায়িত্বের উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সুদৃঢ়, ন্যায়পরায়ণ এবং ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল, যাতে পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার স্বত্ত্বের মধ্যে অধিক ভাগ দেয়া, যাতে সে নিজের ওপর প্রত্যাবর্তনকারী সকল পারিবারিক দায়দায়িত্ব থেকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পালন করে মর্যাদার উপর সমাসীন হতে পারে। বস্তুতঃ নারীর উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার পুরুষের চেয়ে অর্ধেক করা হয়নি, বরং পুরুষের উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এইভাবে পুরুষ এবং মহিলার দাম্পত্য, সামাজিক এবং পারিবারিক দায়দায়িত্ব আদায় করার মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেহেতু একজন নারী বিবাহে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সকল দায়দায়িত্ব এবং ভরণ- পোষণ প্রথমে তার স্বামীর উপর এবং তারপর তার পরিবারের উপর বর্তায়, তাই স্বামীকে অর্থাৎ, ছেলেকে যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী থেকে একটু বেশি না দেওয়া হয় তাহলে তা ছেলের উপর জুলুম হবে, ব্যালেন্স রক্ষা হবে না। কারণ স্বামী যদি কোনো কারণে আয়

করতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে তার স্ত্রীর চাহিদা ও অধিকার মিটানো সম্ভব হবে। কারণ তার সম্পদের উপর স্ত্রীর কৃতিত্ব বৈধ।

এছাড়াও আশ্চর্যের দাবিদার হলো, ইসলাম এখানে থেমে থাকেনি বরং নারীদেরকে আরো বহুদিক থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। দুইভাগের একভাগ তো হলো পিতার দিক থেকে যা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও নারীরা আরো বহুদিক থেকে উত্তরাধিকার পাবে। যেমনঃ- যদি কোনো নারীর ভাই না থাকে, তাহলে তিনি (একা হলে) পিতার ত্যাজ্য সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা দুই বোন বা ততধিক হন এবং কোনো ভাই না থাকে তাহলে তারা তাদের পিতা/মাতার সমুদয় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবেন। যদি এক বোন এবং এক ভাই হয় তাহলে একজন ভাইয়ের অংশের অর্ধেক পাবেন একজন বোন। অর্থাৎ, যদি কেউ এমতাবস্থায় মারা যায় যে তার এক পুত্র ও এক কন্যা (আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই)। তাহলে সমুদয় সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ পাবে পুত্র আর এক ভাগ পাবে কন্যা। এক পুত্র ও দুই কন্যা থাকলে সমুদয় সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ পাবেন পুত্র। আর বাকি দুই ভাগ পাবেন দুই কন্যা (প্রত্যেক কন্যা এক ভাগ করে)। পবিত্র কোরআনুল কারিমে এসেছে, **"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। আর যদি শুধু নারীই হয় দু- এর অধিক, তাহলে তাদের জন্যে ওই ত্যাজ্য মালের তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি (কন্যা) একজনই হয় তাহলে সে জন্য অর্ধেক।"**[২]

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে নারীর অধিকার। খ্রিষ্টান ধর্মে পিতার মৃত্যুর পর যদি তার কোনো পুত্র সন্তান জীবিত থাকে, তবে কন্যা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। এ বিষয়টি প্রচলিত বাইবেলে উল্লেখ আছে। পুত্র সন্তান দু'জন হলে বড় পুত্র পাবে ছোটজনের দিগুণ। পুত্র না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি কন্যার। কন্যা না থাকলে (মৃতের) ভাইয়ের। ভাই না থাকলে নিকটাত্মীয়র। তবুও মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী কিছুই পাবে না। অথচ ইসলাম স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার খুব মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যদি কারো স্বামীর ইন্তিকাল হয় আর সে স্বামীর কোনো সন্তাননা থাকে তাহলে স্বামীর সমূদয় সম্পত্তির এক- চতুর্থাংশ পাবেন। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে তাহলে

স্ত্রী পাবেন এক- অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ)। পবিত্র কোরআনুল কারিমে এসেছে, **"স্ত্রীদের জন্য তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক- চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।"**[৩] সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে মায়ের অধিকার। মা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের ইন্তিকাল হলে সন্তানের যদি কোনো সন্তান- সন্ততি না থাকে তাহলে সেই সন্তানের সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পাবেন মা। আর যদি মৃত সন্তানের কোনো সন্তান- সন্ততি থাকে তাহলে মা সেই (মৃত) সন্তানের সম্পত্তির একশষ্টমাংশ (ছয় ভাগে এক ভাগ) পাবেন। পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, **"মৃতের কোনো পুত্র থাকলে পিতা- মাতার প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা- মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ।"**[৪] এভাবেই ইসলাম সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাহলে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম নারীজাতিকে অবহেলা করেছে?

এইবার আসুন, একধাপ এগিয়ে যাই। ইতিহাসের পাতাগুলো একটু উল্টিয়ে দেখি, ইসলাম নারী জাতিকে যথাযথ সম্মান ও অধিকার দিতে সক্ষম হয়েছে কি না? ইসলাম নারীজাতিকে অন্যান্য সকল ধর্ম থেকে উর্ধ্বে সম্মান, আত্মমর্যাদা, আত্মাধিকার দিয়ে আচ্ছাদিত করেছে। ইতিহাসে এমন ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডও হতো যার কারণে নারীজাতি একসময় বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সর্বপ্রথম ইসলাম এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। আরবের প্রাক- ইসলামি যুগে কন্যা সন্তানকে দারিদ্র্যতা ও অসম্মানের ভয়ে জীবিত পুঁতে ফেলা হতো ও প্রাচীন এথেন্সে কন্যাসন্তান জন্ম দিলে তাকে বন- জঙ্গলে ফেলে রেখে আসতো পাষাণ বাবা। এ উদ্দেশ্য যে, সেখানেই যেন অনাহারে কিংবা বন্যপশুর আক্রমণে মারা যায় নিষ্পাপ মেয়েটি এবং রোমান দার্শনিক *প্লিনি দ্য এল্ডার* লিখেছেন, **"প্রাচীন মিশরে ঋতুচক্র চলাকালে নারীরা আলাদা একটি স্থানে গিয়ে থাকতে হতো, সবদিক দিয়ে তারা অবহেলার পাত্র ছিল শুধু। বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত চীনে নববধূকে অপহরণ করা হতো এবং জাপানেও এমনটা হতো এবং প্রাচীন গ্রিসে, রোমে এবং স্পার্টাতে আরো অসংখ্য জায়গায়।"** সম্মান এবং নারী দুইটি যেন ভিন্ন মেরুর বস্তু ছিল। কুরআন ও হাদিসে এসব বিষয়গুলো নিয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

এবং এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড না করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সভ্যতার দাবিদার ইংল্যান্ডে ডাইনি বলে নারীকে পুড়িয়ে মারার আইন রদ করা হয় ১৭৩৬ সালে। যারা আজ সারা বিশ্বের প্রগতি ও আধুনিকতার নিয়ে চিৎকাররত; সেই ব্রিটেনে নারীর অবস্থা ছিল খুবই করুণ। **Married Womens Property Act :** ১৮৮২ –১৮৮২ –এর আগ পর্যন্ত সে দেশের আইনে নারীদের সম্পত্তি ছিল অবৈধ। বিয়ের আগেও যদি কোনো নারী চাকরি বা অন্য কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করত তাহলে তার বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত তার স্বামী। জার্মানী নারীদের ১৯০০ সাল, সুইস নারীদের ১৯০৭, অষ্ট্রেলীয় নারীদের ১৯১৯ সালের আগে ছিল না কোনো উত্তরাধিকার সম্পত্তি। আজও হিন্দু ধর্মে নারীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। অথচ ইসলাম এসব অধিকার বহু আগে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ইংল্যান্ডে নারীর মতামত দেওয়ার অধিকার আন্দোলনের সূচনা হয় সবে মাত্র ১৮৯৭ সালে। **Millicent fawcett** যখন ***'National Union of women's suffrage'*** বাস্তবায়ন করেন।

অন্যদিকে, কুরআনুল কারিমে সুরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে এবং অসংখ্য হাদীসেও ১৫০০ বছর আগেই উপর্যুক্ত অধিকারের অনুমোদন দেওয়া হয়। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে (যারা মুহাম্মদ দ. এর প্রণীত ধর্ম ব্যবস্থার উপর অবিচল ছিলেন) রাষ্ট্রীয় সভাতে মহিলাদের পরামর্শ নিতেন, যার প্রমাণ মিলে ইমাম সূয়ুতির **তারিখে খুলাফা**তে। খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে মহিলাদের সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারও প্রধান করা হয়। অথচ, আধুনিক সভ্যতার দাবীদার রাষ্ট্রগুলো অসংখ্য আন্দোলনের পর তারা তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় ১৮০০ সালের পর থেকে। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে রাষ্ট্রবস্থাপনার দায়িত্বে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে মহিলাদের নিয়োগ দেওয়া হত। এতটুকুতেও ইতি ঘটেনি, এমনকি সংসদ পার্লামেন্টে আসন নেওয়ার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। কুরআনের ***আত- তাওবাহ ৯- ৭১*** আয়াতে মুসলিম সমাজের দায়দায়িত্বের ভার নারী- পুরুষকে সমানভাবে প্রদান করা হয়েছে। তারপরও বর্তমান বিশ্বে নারীদের সমতা ও জয়জয়কার দেখে এটা ভেবে বসবেন না যে, এসব অধিকার আদায়ের খোলশটা বিগত একশো বছরের চলমান নারী অধিকার আন্দোলন থেকে প্রথম খশে পড়েছে বা আন্দোলনের পর থেকে এই প্রথম অধিকারগুলো উন্মোচিত হয়েছে। এটা একদম ভুল;

কারণ এসব অধিকারগুলো মুহাম্মদ (দ.) ১৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি নারীদের অধিকারে কোনো কমতি রাখেননি। শুধু উত্তরাধিকারের দিক দিয়েই নয় বরং সবদিক থেকে নারীকে সম্মানের পাত্র বানিয়েছেন।

অধিকার দুইধরনের, একটি সত্তাগত অন্যটি সত্তা সম্পর্কিত অধিকার। পশ্চিমা বিশ্বে সত্তা সম্পর্কিত অধিকারে আদায়ে মুটামুটি সচেতন হলেও অপরদিকে সত্তাগত অধিকারে অনেকটাই অসচেতন। যেমনঃ- সত্তাগত অধিকারের সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার হলো 'আত্মসম্মান'। নারীর কাছে এটা খুব গুরত্বপূর্ণ। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে সভ্যতা ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নারীরা আত্মসম্মানকে বাঁচাতে সক্ষম হচ্ছে না। অনেকে এই বিষয়ে দৃষ্টিপাতও করে না, দেখার অভিনয় করছে কেবল। নারী স্বাভাবিকভাবেই লজ্জাশীল হয় এবং নারীর কাছে নিজের আত্মসম্মানের চেয়ে বড় কিছুই নেই। আর আত্মসম্মান নিজ সতীত্বকে ঘিরেই হয়ে থাকে। তারা নারীকে সবজায়গায় উপস্থাপন করছে সতীত্বতা ব্যাতিরেকে। লুণ্ঠিত হচ্ছে সতীত্ব, নারীজাতিকে ব্যবসায়িক পণ্যের মতো করা হয়েছে। নারীকে সম্মানবিহীন অধিকার দেওয়া হয়েছে, যার ফলে দেওয়া না দেওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য পড়ে না। তাদের সভ্যতা অনুযায়ী ইচ্ছে করলেই সতীত্বতা ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। কারণ পরিবেশেই এমন তৈরি করেছে তারা। এসব কি তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে না? অন্যদিকে ইসলাম তাদেরকে সব অধিকার দিয়েছে আর সাথে সতীত্ব ধরে রাখতে পর্দার ব্যবস্থা করেছে। যেমনিভাবে আমাদের ঘরে গুরুত্বপূর্ণ এবং দামি জিনিসকে কাপড়ে মুড়িয়ে আবৃত করে রাখি, তেমনিভাবে মূল্যবান নারীকে পর্দা দিয়ে আবৃত রেখে সকল অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এতে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীকে শুধু অধিকারেই দেয়নি বরং সম্মানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু মানব সমাজ নারী পুরুষের একটি সংমিশ্রিত রূপ। সেহেতু ইসলামে লিঙ্গভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর একটি বাণী দিয়ে ইতি টানছি। যার মাধ্যমে আপনাদের ধ্যান- ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ(দ.) ইরশাদ করছেন, **"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন- পালন করেছে, পুত্র সন্তানকে কন্যাদের ওপর প্রাধান্য দেয়নি, তাদেরকে**

উত্তম আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তাদেরকে বিয়ে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করেছে, সে জান্নাত লাভ করবে।"[৫] এখানে ইসলাম কন্যা সন্তানকে অভিহিত করেছে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে। এভাবে প্রত্যেক কিছুতে নারীকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছে, যাতে সম্মান ও অধিকার অটুট থাকে। ইসলাম নারীকে সমাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল প্রকার অধিকার দিয়েছে। সুতরাং, এটা আর বলার উপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র ইসলাম দিকনির্দেশিত বা নির্ধারিত অধিকারই পারে নর- নারীকে নিজের অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে।

তথ্যসূত্র:

১. সুরা নিসা- ১৭৬
২. সুরা নিসা: ১১
৩. সুরা নিসা: ১২
৪. সুরা নিসা: ১১
৫. আবু দাউদ: ৫১৪৯

লেখক
মোহাম্মদ আবদুল আলিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবি বিভাগ।

গ্রন্থকথা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : নির্বাচিত সাক্ষাৎকার : আজ ও আগামীকাল

সংকলন ও সম্পাদনা: ইমরান মাহফুজ
প্রকাশনা: ডেইলি স্টার বুকস
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০/-

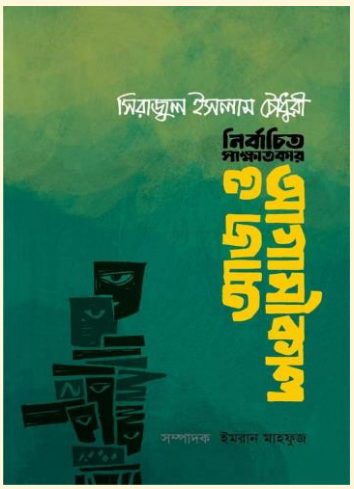

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের আপসহীন বুদ্ধিজীবী হিসেবে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। দু' বার ঢাবির উপাচার্য হবার সুবর্ণ সুযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছেন তিনি, কেন? তিনি বলছেন: "সরকারের তাঁবেদারি করতে হবে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে আমার পক্ষে কাজ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"

এমন আদর্শবাদী একজন শিক্ষক, আপসহীন বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের প্রতি নজর দিয়েই সমকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষক ইমরান মাহফুজের সম্পাদনায় ২১টি সাক্ষাৎকার একত্রে প্রকাশিত হয়েছে 'নির্বাচিত সাক্ষাৎকার : আজ ও আগামীকাল' নামে। এককথায় বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি এবং ভবিষ্যত নিয়ে যারা চিন্তা করেন তাদের জন্য বেশ কিছু প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী হতে পারেন পাঞ্জেরী– এ বইয়ে সন্নিবেশিত সাক্ষাৎকারগুলোর মাধ্যমে। সাক্ষাৎকারগুলোর বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণের পর মনে হয়েছে 'গত ও আগামী' দিলেই যুৎসই হতো বেশি– কারণ অতীতের কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতে দৃষ্টি ফেলতে এ বইটি চিন্তাশীলদের জন্য অবশ্যপাঠ্য।

গ্রন্থকথা

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) জীবনদর্শন

লেখক: ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি
অনুবাদক: আব্দুল্লাহ যোবায়ের
প্রকাশনী: ঐতিহ্য
মুদ্রিত মূল্য: ১৮০/-

মুসলিম বিশ্বে আবদুল কাদের জিলানী এক প্রসিদ্ধ নাম–তাঁর প্রভাব এড়িয়ে চলা মুসলমানদের পক্ষে কঠিনই নয় শুধু, প্রায় অসম্ভব। খ্রীসের পুরাণের মতো আজ থেকে নয়শত বৎসর পূর্বের বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীকেও নিয়ে প্রচলিত আছে শত শত মুখরোচক কাহিনী– সত্য- মিথ্যার সমন্বয়ে। এবং সেজন্যই সাধারণ মুসলমানদের জন্য তাঁকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে জানা আজও দুরূহ ব্যাপার– কিন্তু অসম্ভব নয়। যে সূত্রাবলির মাধ্যমে জানা সম্ভব তন্মধ্যে অন্যতম একটি জগদ্বিখ্যাত আলেম, হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. কর্তৃক রচিত বড়পীরের জীবনীগ্রন্থটি, যা বড়পীরের ইন্তেকালের আড়াইশো বৎসরের মধ্যে রচিত। দুর্লভ এ কিতাবটি বাংলায় তরজমা করেছেন অনুবাদক আব্দুল্লাহ যোবায়ের। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীকে সত্যজ্ঞানে জানার জন্য বাংলাভাষী মুসলমানগণ এ গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন, নির্দ্বিধায়। ভূমিকায় ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন: "পুস্তিকাটি আমি এই আশায় সংরক্ষণ করছি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় এটা যেন আমার জন্য সমস্ত ভীতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে নিরাপদ ঢাল হয়ে উঠে।"

বিজ্ঞান

সায়েন্স ফিকশনের গোড়াতে মুসলিমদের কৃতিত্ব

খায়রাতুন বিনতে বাবুল

বিশাল এক ডাইনির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্পের মতোই ভয়ঙ্কর। চেহারা দেখে ভয়ে শরীর কাঁপছে , সেই সঙ্গে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জড়ো হচ্ছে। এই শহরের নিয়ম হলো নারীদের কোনো ভুল নজরে এলেই তাদের ডাইনি বলে আখ্যা দেওয়া আর শাস্তিস্বরূপ শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। নিজের চোখের সামনে এই অন্যায় দেখে বহুবার প্রতিবাদ করতে চেয়েও নিরুপায় হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজ স্বচক্ষে যা দেখছি তাতে প্রথমবার মায়ের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলো। সত্যি কি তাহলে প্রেতাত্মা বা ডাইনি আছে আর মায়ের সাথে কি এদের কোনো সম্পর্ক আছে? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঔষধের থলে নিয়ে মা হাজির হলেন, আমায় দেখে দ্রুত বাইরে নিয়ে এলেন.........

যারা কমবেশি কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন পড়েন তারা গল্পটির সঙ্গে কেপলারের 'সম্নিয়াম' লেখার কিছুটা মিল খুজে পাবেন। সম্নিয়াম, যার অর্থ কল্পনা। কেপলার এতে চন্দ্র অভিজানের কল্পনা করেন। এখানে নায়কের বাবা- মায়ের সঙ্গে আত্মা- প্রেত্মাদের যোগাযোগ ছিলো এবং পরবর্তীতে নায়ক তাদের কাছ থেকে মহাকাশ ভ্রমণের কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু এই লেখাই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। কেপলারের মা ঔষধ ও বিভিন্ন পথ্য বিক্রি করতেন। এই সুযোগে কেপলারের বিরোধিরা বইটিকে তারই মায়ের ডাইনি হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দায়ের করে এবং শাস্তিস্বরূপ তার মাকে অন্ধ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। সেই সময় ধর্মযুদ্ধের কারণে কেপলারে সায়েন্স ফিকশন তার জন্যেই বিপদ ডেকে আনে। বিজ্ঞানী হিসেবে কেপলার তার কাজের মাধ্যমে নিজের মাকে বাঁচানোর সাথে সাথে সমাজকে কুসংস্কার হতে বের করে আনেন। সাধারণত একেই কল্পবিজ্ঞানের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু কেপলারের বহু বছর আগে থেকেই মুসলিম বিশ্বে সায়েন্স ফিকশনের চর্চা হয়ে আসছে। শুনতে অবাক লাগলেও সত্য যে, ইসলামি ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্বর্ণযুগটিকে ইসলামি সায়েন্স ফিকশনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। পশ্চিমাদের একচেটিয়া অধিকার, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি আর ইসলাম সম্পর্কিত সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দরুন আজও এসব লেখার বেশিরভাগ পশ্চিমা সাহিত্যে অপরচিত।

বিজ্ঞান

সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান বলতেই আমরা সাধারণত ভিনগ্রহের প্রাণী, ভবিষ্যতে যাওয়া বা রোবট ইত্যাদি বুঝি। যেখানে বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ, সময় সব মিশে আমাদের সাধ্যের অধিক কল্পনা করতে শেখায়, আর সেই কল্পনায় ইসলামের বিভিন্ন মুজেজা মুসলিম সাহিত্যিকদের রসদ যুগিয়ে এসেছে। ফলে সায়েন্স ফিকশন শুধু ভীনগ্রহী প্রাণী বা সময় ভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করেছে। এছাড়া কোরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন মোজেজা মুসলিম লেখকদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যদিও অনেকে সায়েন্স ফিকশনকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বা আজগুবি কল্পনা বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তা আরবি গল্পের বেশি অনুবাদ না হওয়ার কারণে এই ধারণার জন্ম হয়েছে বলে মনে করেন সায়েন্স ফিকশন সংশ্লিষ্টরা।

মেরি শেলীর 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন' বইটিকে প্রথম সার্থক সায়েন্স ফিকশন বলা হলেও 'এ ট্রু হিস্টোরি' যা একজন সিরিয়ান লেখক দ্বিতীয় শতকে চাঁদে ভ্রমণ নিয়ে কল্পকাহিনী লেখেন এবং এটি মেরি শেলীর বহু শতাব্দী পূর্বেই রচিত হয়েছে। নবম শতকে আল ফারাবির লিখিত **'মাবাদিয়ুল আহল আল মাদিনাতুল ফাদ্বিলাহ'** বইটি অন্যতম। এছাড়াও **'আল রিসালাহ আল কামিল ফি সিরাতিল নবি'** গ্রন্থটি প্রাথমিক কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম একটি উদাহরণ। বারশ শতকে রচিত ইবনে নাফিসের এই উপন্যাসটিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সত্যকে কল্পনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া এটি প্রাথমিক দর্শন সাহিত্যেরও অন্যতম নজির। একই উপন্যাসের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন যা সেই যুগের অনন্য সৃষ্টি। মুসলিম সমাজের মধ্যে সুন্নিয়তের ধারা ও নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই ছিলো তার প্রধান উদ্দেশ্য। উপন্যাসটিতে কামিল নামক এতিম কিশোরের মরুদ্বীপ হতে সভ্য দুনিয়ায় আসা এবং সেখানে এসে স্বশিক্ষিত হয়ে নিজের যুক্তিবোধ দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় উন্মোচন নিয়ে বর্ণনা করা হয়। কিয়ামতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তিনি রচনাটিকে যে পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন তা কল্পবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদাহরণে পরিণত হয়েছে।

তবে, এসব নিয়ে পর্যালোচনার অভাব ও ভাবধারার অপরিবর্তনের ফলে ইসলামি সায়েন্স ফিকশন এখনো স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই রচনাবলির উপর ভিত্তি করেই

পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বিখ্যাত চরিত্র ও রচনার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু বছর ধরে এই বৈশিষ্টগুলোই সকল ধারার লেখকদের রসদ যুগিয়েছে। বলা যেতে পারে ইসলামিক আদর্শের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও ধর্মকে রক্ষার এক অন্যতম মাধ্যমই হলো সায়েন্স ফিকশন। তবুও বর্তমানে মুসলিম সমাজের দুর্দশা সত্ত্বেও এই মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে বহু লেখক লিখে চলেছেন তার স্বপ্নের গল্প।

লেখক
খায়রাতুন বিনতে বাবুল মিথিয়া
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি সিটি কলেজ

ক্যালিগ্রাফি

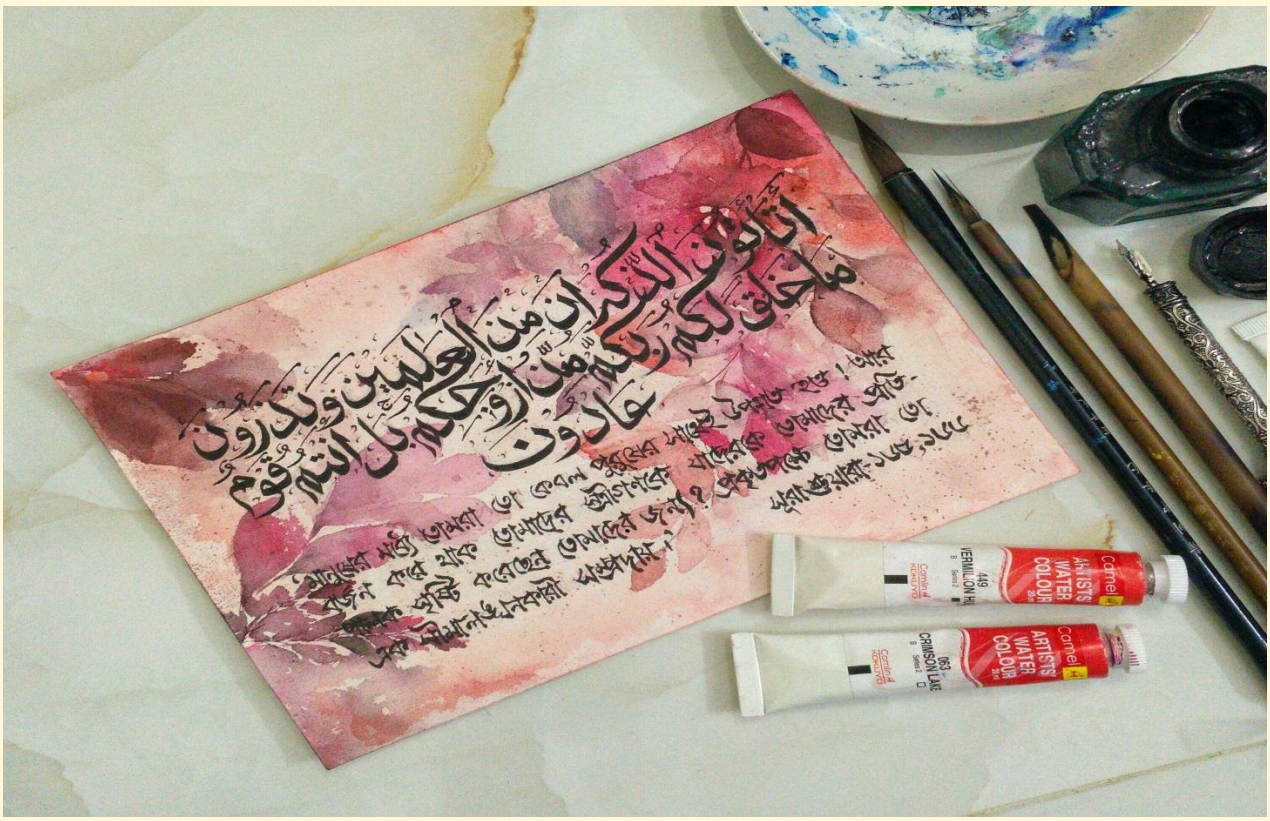

কত বছর আগের কথা!
এক জাতি জড়িয়ে পড়েছিল এক নিষিদ্ধ কাজে। বার বার রবের তরফ থেকে এসেছিল নিষেদ্ধাজ্ঞা। কিন্তু, তারা একের পর এক ঐশীবানীকে করেছিল প্রত্যাখ্যান!

আজ একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত এই জাতি। যাদের আল্লাহ সন্মানিত করেছেন উত্তম উম্মাহ হিসেবে, তারা আজ সেই একই অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। আদালতে মোকাদ্দমা চলছে এই অপকর্মকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য।

অথচ আমরা কি ভুলে গেছি! এই প্রাচীন জাতির সাথে রবের ব্যবহার কিরূপ ছিল! পুরো লুত সম্প্রদায়কে আযাবের দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন রাব্বুল আলামীন। আমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ রেখে দিয়েছেন মৃত সাগর। সাথে সর্তক করে কুরআনে পাকে ইরশাদ করছেন, **“মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত হও! আর বর্জন করে থাক তোমাদের স্ত্রীগণকে যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য? প্রকৃতপক্ষে তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়”**।

তবে কি আমরাও কতকের অপকর্মের জন্য এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতিতে রূপান্তরিত হতে চলেছি!
এই ফিতনার থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

- ফাতিমা তাহমিম

কবিতা

শহীদে কারবালা

ফররুখ আহমদ

ফোরাতের তীরে তীরে কাঁদে আজও সংখ্যাহীন প্রাণ ;
উদ্‌ভ্রান্ত ঘূর্ণীর মত শান্তি চায় মাতমে– কান্নায়,
যেখানে মৃত্যুর মুখে তৃষ্ণাতপ্ত মরুর হাওয়ায়
জিগরের খুন দিল কারবালার বীর শহীদান।
স্মৃতির পাথর পটে সে কাহিনী র'য়েছে অম্লান
উজ্জ্বল রক্তের রঙে, মোছেনি তা মরু সাহারায়,
লোভের পঙ্কিল পথে অথবা রাত্রির তমসায়
যেখানে জ্বালালো দীপ সত্যাশ্রয়ী আদম সন্তান।

নির্ভীক মুসার পণ, খলিলের সুদৃঢ় ঈমান
যেখানে দেখেছি দীপ্ত, মসীকৃষ্ণ রাত্রির ছায়ায়
কুতুব তারার মত প্রোজ্জ্বল আপন মহিমায়
যেখানে দেখেছি চেয়ে সর্বত্যাগী হুসেনের দান,
যেখানে শুনেছে প্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের গান
পুঁথির পাতায় নয় জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ॥

[মুহূর্তের কবিতা : ১৯৬৩]

একটি সনেট

কাজী নাসির মামুন

প্রেমের জমিনে কত হাইব্রিড বড় অফিসার
পরের মাথায় শুধু বিলি কাটে, ঘোরায় আঙুল।
চরিত্রে জাতীয় রঙ, শাপলাও জংধরা ফুল।
ফুল নয়, প্যানশন, টেবিলেই ভাসে অধিকার;
আগাম কিছুটা চায় প্রাণযোগ সুডৌল মুদ্রার।
আব্বার ক্লান্তির পাশে আমাদের প্রেমের মুকুল
যেন তুমি স্পিড মানি, ছড়িয়েছো লেলিহান চুল;
আমায় ধরেছে নেশা সততায় টাকা ছাড়াবার।

স্খলিত চেয়ারে বসে গিরগিটি বহু রঙ ধরে;
রঙের আকল বুঝে হাতে হাতে গুঁজে দেই কিছু।
পেনশন ফুলমধু ভ্রমরের উড়ন্ত স্বাক্ষরে
নীতির দুর্ভোগ ছুঁয়ে এসেছে আব্বার পিছু পিছু।
আম্মার কপালে ঘাম দুরূহ টাকায় মোছে না তো;
সমাজ আগুনে পুড়ে ছাই দেবে, যদি হাত পাতো।

কবি-
কাজী নাসির মামুন

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ লখিন্দরের গান (২০০৬), অশ্রুপার্বণ (২০১১), কাক তার ভোরের কোকিল (২০১৭) রোহিঙ্গাপুস্তকে আত্মহত্যা লেখা নেই (২০১৮),'লখিন্দরের গান' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ Song of Lokhindar Translated by Ahmed S. Kaderi২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় এ্যান্টিভাইরাস প্রকাশনি থেকে।

পেশা:
সহকারি অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

কবিতা

মুসলমানের ছেলে

হাসান রোবায়েত

মধ্য দুপুর চিলের বিলাপ
হাওয়ার খবর উড়ছে
একলা এখন কোথায় তুমি
কাশের বাগান পুড়ছে—

কাল তোমাকে শুনেছিলাম
সূর্যমুখী- রোদে
দূরের পুকুর তাকিয়ে থেকে
শুকায় প্রতিশোধে!

রাত পুড়েছে অন্ধকারে
হারিকেনের তেলে—
হঠাৎ মনে টান পড়লো
মুসলমানের ছেলে—?

কবি-
হাসান রোবায়েত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত বই — ঘুমন্ত মার্কারি ফুলে কবিতা]; চৈতন্য, ২০১৬ [ঘুমন্ত মার্কারি ফুলে তীয় সংস্করণভার], বৈভাষিক, ২০১৮কবিতা] মীনগন্ধের তারা [; জেব্রাক্রসিং, ২০১৮ [কবিতা] আনোখা নদী; তবুও প্রয়াস, কলকাতা, ২০১৮ [কবিতা] এমন ঘনঘোর ফ্যাসিবাদে; ঢাকাপ্রকাশ, ২০১৮ [কবিতা] মাধুডাঙাতীরে; ঐতিহ্য, 2020

আমার স্বাধীনতা

মো. রেজাউল করিম

তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার দর্শন
হৃদয়ের গহনে চব্বিশ বছরের লালিত স্বপ্ন,
কোটি মানুষের চেতনা, সত্তা, পরমাত্মা
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সংগ্রাম, লড়াই।

তুমি কৃষকের হাসি, কিষানীর গান,
মজুরের সাহস, শ্রমিকের প্রতিপত্তি,
কলমজীবীর উদ্দিপনা, শিক্ষাবিদের বিবেক।
স্বাধীনতা, তুমি কোটি মানুষের অধিকার।

স্বাধীনতা, আমি তোমার গান গাই
কিষান- কিষানী, মজুর শ্রমিক,
কলমজীবী ও শিক্ষাবিদ- কোটি হৃদয়
তোমার চেতনা ও অস্তিত্বের কথা বলে।

শোনো তবে, চিৎকার করে আমি বলতে চাই
আমি- আমরা, কোটি মানুষ আজ স্বাধীন
যেমন করে প্রত্যুষে চিৎকার করে পক্ষীকুল
দ্বিধা, ভয়, শঙ্কা- আশঙ্কা ছাড়া, তেমনই করে।

আমি- আমরা বাঁচতে চাই, কথা বলতে চাই
চব্বিশ বছর যা বলতে চেয়েছিলাম।
আমি- আমরা হাসতে চাই, যেমন যেমন করে
হাসতে চেয়েছিলাম, কথা বলতে চেয়েছিলাম।

স্বাধীনতা, তোমার অস্তিত্বের পরশ পেতে চাই;
তোমার অশরীরি অস্তিত্বের গন্ধ পেতে চাই;
তোমাতে আমি অবগাহন করতে চাই,
মৎস্য যেমন থাকে পানিতে অবগাহন করে।

তোমার অস্তিত্বের লড়াইয়ে সম্মুখ সারিতে থাকতে চাই,
১৯৭১- র বীর শহীদদের মতো, বন্দুক হাতে
নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই, ত্রিশ লক্ষের মাঝে।
আমিও আমার নাম লেখাতে চাই।

তবুও হে স্বাধীনতা, আমি তোমার স্বাদ পেতে চাই।

কবি নজরুল

মুহিব কাদেরী

হে কবি, তোমায় চিনেছে যারা
নিজেকে চিনেছে তারা;
তোমার নামে তাদের হৃদয়
আনন্দগানে আত্মহারা।

তোমায় যারা অবহেলা করে
চেতনায় ভীরুজন,
তাদের হৃদয় অবরুদ্ধ
হারিয়েছে সত্য মন।

মানবতার কথা অনেকেই বলে
মুখেমুখে রয়,
তোমার লেখায় তোমার মনে
মানবতার জয়।

প্রেমের বাণী তোমার কাছে
নিছক রস নয়,
তোমার প্রেমে জ্বলেছে আলো
ছড়িয়েছে বিশ্বময়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী
মুখে অনেকেই বলে,
অসাম্প্রদায়িক চিন্তা নিয়ে
তোমার কলম চলে।

দেশপ্রেম সাহিত্যে রচে
অনেক লেখকগণ,
মনের মাঝে দেশের চিন্তা
পুড়িয়েছে সর্বক্ষণ।

তোমার মনে দেশের জন্য
ভালোবাসা অন্তহীন,
সাহিত্য- গানে সদা উচ্চারিত
বেজেছে অগ্নিবীণ।

সাম্যবাদের বাণী ছড়ায় অনেক
কবিগণ,
মানুষে মানুষে সমতার কথা
মরা প্রাঙ্গন।

তোমার প্রাণে তোমার গানে
সমতার বাণী,
ফুটেছে যেনো গুলবাগিচায়
জীবনের বাণী।

কবি
মুহিব কাদেরী
প্রভাষক, বাংলা
চট্টগ্রাম কলেজ

ফোরাত নদীর কুল

সাদিয়া জান্নাত

হিজরী সনের প্রথম মাসে
শোক কাতরে গড়া,
কারবালার ঐ ফোরাত নদী
রক্তাশ্রুতে ভরা।

ইমাম হোসেন সবার সাথে
চলল ঘোড়া নিয়ে,
মৃত্তিকাতে অশ্বখানার
পা দাবিলো গিয়ে।

চতুর্দিকের করুণ ধ্বনি
উঠলো সেদিন ভেসে,
কুফা ছেড়ে কারবালাতে
পৌঁছলো সবে এসে।

পিপাসিত মানুষ গুলোর
শুধুই অশ্রু ঝরে,
এক ফোঁটা জল পাওয়ার আশে
শহীদ বেশে মরে।

মহররমের দশ তারিখে
ফোরাত নদীর কুলে,
হায় হোসেন আর হায় হোসেনে
চারপাশে রব তুলে।

কবি
সাদিয়া জান্নাত
চট্টগ্রাম কলেজ, বাংলা বিভাগ, তয় বর্ষ।

কবিতা

মুহররমের আগমনি গান

মুহাম্মদ সৈয়দুল হক

দিগন্তে ঐ উঠেছে হেলাল
নতুন বার্তা নিয়ে
মুহররমের আগমনি গানে
ধরাধাম গেলো ছেঁয়ে।

এসেছে ধরায় নতুন বর্ষ
বছরেক আরো গেলো
পাখপাখালির কলরবে ঐ
নবসুর ধরা পেলো।

চারিদিকে ঐ নতুনের ডাকে
আলোড়ন সীমাহীন
গাছগাছালী ও তরুলতা সবে
গেয়ে চলে নিশিদিন।

সোনালী দিনের শুভ ইতিহাস
উঠে উঠে আসে ফের
বীরত্বে গাঁথা হিজরিপতি
বীরবল ওমরের।

আসে যবে এই মহিয়ান মাস
স্মৃতিপট নড়ে উঠে
পশ্চিমাকাশের আভা সমুদয়
রক্তিম হয়ে ছোটে।

কানে বাজে ফের পুরোনো কান্না
পানি পানি পানি রব
যে রবের প্রতি ছুড়েছিলো তীর
জানোয়ার যতসব।

খুনেভরা সেই লাল- কারবালা
হুসেনের কাটা ছের
প্রতি মুহরমে নব আয়োজনে
আসে ফিরে আসে ফের।

এজিদ- দলের নির্মম সেই
অনাচারী আয়োজন
পড়লে এ মনে থাকে কিরে হুঁশ
বলো ওরে মহাজন!

কাঁদে হিয়া মোর সেই শোকাতুর
কারবালা- ফোরাতের
ব্যথিত মননে খুন চাপে ধ্যানে
প্রতিশোধ গ্রহণের

এনে দাও খোদা, এজিদ- সিমার
নরাধম দুজনায়
রাঙিয়ে নিতাম এই দুটি হাত
রক্তের গঙ্গায়।

মুহররম! কারবালা!
একসুরে বাঁধা দুই
আনন্দ- বেদনার ভেলাতে চড়ে
মুসলিম- ঘরে তুই।

এক দেহে এক মন

মুহাম্মদ শাওয়াল হোসাইন

এভাবেই ফের খুলে যাক আজ রুদ্ধ সকল দ্বার
মুসলিম সবে গর্জে উঠুক সফলতা বার বার ।

মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী, শ্লোগান দিয়েই সবে
তাওহীদ বাণী রেসালাত ধ্বনি, কায়েম করেছে ভবে।

হাতে তলোয়ার বুকে হিম্মত, মুসলিম বীর সব
বদ্ধ দুয়ার খুলে দিতে ফের, শক্তি দিয়েছে রব।

আয়া সোফিয়ার বদ্ধ দুয়ার খুলে যাওয়ার এই ক্ষন
মুসলিম জাতি ফের এক হতে, করা চাই আলাপন।

চাই না বিভেদ মুসলিম হলো, এক দেহে এক মন
হে মুসাফির, ফিরে আসো তবে, হাতে- হাত করি পণ।

স্রষ্টার প্রীতি নবীজীর প্রেম, স্থির করে তবে
আল্লাহ ধ্বনি- দরুদের বাণী, ছড়িয়ে পড়ুক ভবে।

কবি
মুহাম্মদ শাওয়াল হোসাইন
আলিম ২য় বর্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।